সোনার বাংলা গ্রন্থমালা

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প

পরিবেশক

শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী, এম. এ., বি. এল.

প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্-সি.
শ্রীগুরু লাইব্রেরী,
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

চিত্রশিল্পী—শ্রীচারু রায় ও শ্রীঅর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৫৫

....

পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

মুদ্রক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস,
৯১।১এল, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ দাম ২॥০

পরিচয়

শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। লেখক হিসাবে ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—প্রকাশক হিসাবে ইনি বর্ত্তমান যুগের কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিককে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচায়িত করেন। ইঁহার প্রকাশিত 'কালি-কলম' পত্রিকাখানি বেশী দিন জীবিত ছিল না সত্য, কিন্তু তাহা স্বল্পায়তন জীবৎকালেই বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্টরূপ সেবা করিয়াছিল। এ-সকল কথা তরুণরা জানেন না, কিন্তু প্রবীণ সাহিত্যিকমাত্রই জানেন।

এই পুস্তকগুলিকে তিনি বিশ হইতে পঁচিশ বৎসর আগে রচনা করেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে অপর কেহই বালকবালিকা-গণের উপযোগী রূপ দান করেন নাই। যাঁহারা যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যিক তাঁহাদের সাধনার সঙ্গে বালকবালিকাদিগের পরিচয় সাধন করিতে হইলে তাঁহাদের মূল পুস্তকের দ্বারা অনেক সময় তাহা সম্ভব হয় না। তাঁহাদের পুস্তকের মূলকথা সহজ সরস ভাষায় ও ভঙ্গীতে পরিবেশন করিতে হয়।...বালকবালিকাদিগের উপযোগী করিতে হইলে তাহাদের অনধিগম্যঅংশগুলি বর্জ্জন করিয়া বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির গল্পাংশ শুধু বিবৃত করিতে হয়। শ্রীমান শিশিরকুমার বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গেই তাহা করিয়াছেন। পুস্তকগুলিতে বঙ্কিমের উপন্যাসের সংক্ষিপ্তরূপ উপনিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক বঙ্কিমের বিবৃতি ও ভাষাভঙ্গী যতদূর সম্ভব অবিকৃত রাখিয়াছেন। নবরূপে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির মর্য্যাদাহানি হয় নাই।

বাল্মীকি-রামায়ণের একটি আদর্শ অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শ্রীমান শিশিরকুমার বর্ত্তমান যুগের প্রাঞ্জল স্বচ্ছ তরল আদর্শ ভাষাতে বাল্মীকি-রামায়ণের আদি ও অযোধ্যাকাণ্ডের ঠিক মূলানুগত অনুবাদ করিয়া সে অভাব কতকাংশে দূর করিয়াছেন। অবশিষ্ট কাণ্ডগুলি প্রকাশিত হইতে পারিলে সমগ্র গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।...

শ্রীকালিদাস রায়
(কবিশেখর)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার নিয়োগী প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে 'সোনার বাংলা গ্রন্থমালা'-র অন্তর্ভূক্ত 'ছোটদের বঙ্কিম—আনন্দমঠ', 'ছোটদের বঙ্কিম—দেবী চৌধুরাণী' ইত্যাদি প্রকাশ করেন। তখনই তাহার বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু শিশিরবাবু যেন সে যুগ হইতে কিছু অগ্রবর্তী ছিলেন—আর সেই কারণেই বোধ হয় বইগুলি তখন তেমন প্রচার লাভ করে নাই। যাহা হউক, তাহার পর এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে; নানাদিকের নানা পরিবর্তনের সহিত ছোটদের জন্য রচিত সাহিত্যেরও অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্তমানের ছোটরা এ বিষয়ে তাহাদের পূর্ববর্তীদের চেয়ে অনেক বেশী সৌভাগ্যবান। এই সময়ে শিশিরবাবুর পুনরায় 'ছোটদের বঙ্কিম'-এর নূতন সংস্করণ এবং 'বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প', 'বঙ্কিমচন্দ্রের আরো গল্প', 'বঙ্কিমচন্দ্রের আরো।আরো গল্প' ইত্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে। বইগুলি পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। প্রধানতঃ ছোটদের জন্য রচিত হইলেও বড়রাও ইহা পাঠ করিলে কম

আনন্দ পাইবেন না। এই শ্রেণীর বই এত সতর্কতা, নিষ্ঠা ও দরদের সহিত সম্পাদিত হইতে পূর্ব্বে আমরা দেখি নাই। সকল বইগুলি দেখিবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

(সম্পাদক, শনিবারের চিঠি)

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার নিয়োগী সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনি বাল্মীকির রামায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প এবং Shakespeare-এর নাটকের বাংলা ভাষাতে সার সঙ্কলন করিয়া স্কুল-কলেজের ছাত্রদের পাঠোপযোগী করিয়াছেন। আমি বইগুলি পড়িয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি যে, শ্রীযুক্ত নিয়োগী রচিত বইগুলি পড়িয়া আমাদের তরুণ ছাত্রদের সাহিত্যরস উপলব্ধি করিবার শক্তি জন্মিবে ও ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রকৃত সাহিত্যিক রসবোধের অধিকারী হইবে। আমি এই বইগুলির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা-ব্যবস্থার আর্টস-বিভাগের সভাপতি)

৩১।১১।৫০

নিবেদন

ত্রিশ বৎসর পূর্বে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী সংক্ষিপ্ত করিয়া 'সোনার বাংলা গ্রন্থমালা'-র অন্তর্গত 'ছোটদের বঙ্কিম—আনন্দমঠ', 'ছোটদের বঙ্কিম—দেবী চৌধুরাণী' ইত্যাদি প্রকাশ করি। তখন উহা সুধিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জন করে এবং রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিজ হইতে কোন কোন বই ছাত্রদের পাঠ্যরূপে নির্বাচন করেন। কিন্তু বইগুলি তখন যথোচিত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। শুধু এই বইগুলি কেন, অন্যান্য উৎকৃষ্ট বইও তখন যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। বোধ হয় দেশের তৎকালীন অবস্থাই তাহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। যাহা হউক, এই সকল পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের পক্ষে তখন যে-সকল অন্তরায় ছিল, তাহা এখন অনেকটা দূর হইয়াছে—সেজন্য পুনরায় এই প্রচেষ্টা। এই শ্রেণীর সাহিত্য যত প্রকারে যত বেশী প্রচারিত হয় ততই ভাল।··· 'বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প', 'বঙ্কিমচন্দ্রের আরো গল্প', 'বঙ্কিমচন্দ্রের আরো আরো গল্প' ও 'বঙ্কিমচন্দ্রের মজার গল্প' প্রকাশিত হইল। বিশেষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে কাজটি সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি—গোঁজামিল দিয়া বা যা-তা করিয়া কাজ সারি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব এবং ভাষাও যথাসম্ভব বজায় রাখা হইয়াছে। তথাপি ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা রহিয়াছে, সাহিত্যামোদীদের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইলে তাহা পরবর্তী সংস্করণে দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ইতি—

গৃহভারতী,
৮এ, ওয়েভারবার্ণ রোড,
কলিকাতা-২৯

বিনীত নিবেদক—
শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী
:২।২।৬২

ওঁ

শ্রীমতী গৌরী রায়

ও

শ্রীমতী সতী দাশগুপ্তা কল্যাণীয়াসু—

গৌরী-মা ও সতী-মা,

বহু বৎসর পূর্বে তোমাদিগকে শুনাইব বলিয়া যে গল্পগুলি রচনা করিয়াছিলাম, এখন দিদিমণি ও দাদু-ভাইদের শুনাইবার জন্য তাহার কয়েকটি গল্প তোমাদের হাতে দিতেছি। ইতি—

বৈশাখ, ১৩৫৫

তোমাদের বাবা

সূচি

সোনার বাংলা গ্রন্থমালা

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প ... ... ২॥০

বঙ্কিমচন্দ্রের আরো গল্প ... ... ২॥০

বঙ্কিমচন্দ্রের আরো আরো গল্প ... ২॥০

বঙ্কিমচন্দ্রের মজার গল্প ... ... ২॥০

ইত্যাদি ইত্যাদি

আনন্দমঠ

১

১১৭৬ সাল। বাঙ্গালায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ—মহামন্বন্তর। দেশে বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়া বেচিল। জোতজমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল—জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

পদচিহ্ন গ্রাম। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত

মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর।...

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান—কিন্তু আজ ধনী-নির্ধনের একদর। তাঁহার আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। এখন আছেন, তাঁহার ভার্যা কল্যাণী ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা—সুকুমারী।

মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, "এরূপে ক'দিন চলিবে? চল, মেয়েটি লইয়া সহরে যাই।"

পরদিন প্রভাতে দুইজনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটিকে কোলে করিয়া রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পায়ে পায়ে ডাকাত লুঠেরা ফিরিতেছে বলিয়া মহেন্দ্র বন্দুক, গুলি ও বারুদ সঙ্গে লইলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্র, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে। তাঁহারা বড় কষ্টে পথ চলিতে লাগিলেন। দুইজনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও সহ্য হয়—মেয়েটির ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য হয় না। অতএব তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে এক চটিতে পৌঁছিলেন। কিন্তু কই? চটিতে তো মনুষ্য নাই! মহেন্দ্র বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকহাঁক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না।

তখন স্ত্রী-কন্যাকে একটি ঘরের ভিতর শোয়াইয়া কল্যাণীকে বলিলেন, "একটু তুমি সাহস করিয়া একা থাক, দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব।" এই বলিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন।...

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে, কল্যাণীর মনে বড় ভয় হইতেছিল। সেই জনশূন্য স্থানে প্রায়-অন্ধকার কুটীরমধ্যে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে তিনি সম্মুখের দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। পরে অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, বিকটাকার কতকগুলি মনুষ্য নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিয়া কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্ছিতা হইলেন। সেই প্রেতবৎ পুরুষেরা তখন কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র দুগ্ধ লইয়া সেখানে আসিয়া অনেক অনুসন্ধানেও স্ত্রী-কন্যার কোন সন্ধান পাইলেন না।

২

বনমধ্যে লইয়া গিয়া দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল। কল্যাণীর অলঙ্কারগুলি তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইলে, একজন দস্যু বলিল, "সোনা-রূপা লইয়া কি করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুঠা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়।" তখন সকলেই গোল করিতে লাগিল, "চাল দাও, চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনারূপা চাহি না।" দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে গেলে, সকলে মিলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। দলপতিও অনাহারে শীর্ণ ও ক্লিষ্ট—দুই-এক আঘাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। তখন উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল, "শৃগাল-কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি, এস ভাই, আজ এই বেটাকে খাই।" আর একজন বলিল, "যদি মহামাংস খাইয়াই প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে

ঐই বুড়ার শুকনা মাংস কেন খাই? আজ যে কচি মেয়েটাকে লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাকেই পোড়াইয়া খাই।" তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা লইয়া শুইয়া ছিলেন, সেইদিকে চাহিল। দেখিল, সে স্থান শূন্য। দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া বনমধ্যে পলাইয়াছেন। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া, মার মার শব্দ করিয়া সেই প্রেতমূর্তি দস্যুদল চারিদিকে ছুটিল।...

কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। বন অত্যন্ত অন্ধকার ও কণ্টকাকীর্ণ। মেয়েটির গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল। শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কন্যাটি ভয় পাইয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে বসিয়া, কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া মনপ্রাণে কেবল শ্রীমধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দসৌরে।
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

ক্রমে গীত নিকটবর্তী এবং আরও স্পষ্ট হইতে লাগিল। শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া গীত বাজিল। কল্যাণী নয়নোন্মীলন করিলেন। তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে। সেই অর্ধস্ফুট চন্দ্ররশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে এক শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন ঋষিমূর্তি! অন্যমনে কল্যাণী প্রণাম করিবার জন্য মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন।...

প্রথম চৈতন্য হইলে কল্যাণী দেখিলেন, তিনি একটি কুঠারীমধ্যে

কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন

রহিয়াছেন। সম্মুখে সেই মহাপুরুষ। তিনি বলিলেন, "মা, এ দেবতার ঠাঁই, শঙ্কা করিও না। একটু দুধ আছে; কন্যাকে কিছু খাওয়াও, আপনি কিছু খাও।" কল্যাণী সেই মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া গলদশ্রুলোচনে বলিলেন, "আমার স্বামী অভুক্ত আছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে, কিংবা ভোজনসংবাদ না শুনিলে, আমি কি প্রকারে খাইব?"

তখন ব্রহ্মচারী একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া, কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইলেন। বুঝিলেন, কল্যাণী মহেন্দ্র সিংহের পত্নী। বলিলেন, "মা, তুমি নির্ভয়ে এই দেউলমধ্যে অবস্থিতি কর, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।"

৩

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। ব্রহ্মচারী নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর যুবাপুরুষকে বলিলেন, "ভবানন্দ, আমি মহেন্দ্র সিংহের স্ত্রী-কন্যাকে চোরের হাত হ'তে উদ্ধার করিয়াছি। তুমি মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া তাহার স্ত্রী-কন্যা তাহার জিম্মা করিয়া দাও।"

ভবানন্দ স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মচারী স্থানান্তরে গেলেন।...

এদিকে চটিতে স্ত্রী-কন্যার কোন সন্ধান না পাইয়া মহেন্দ্র নগরের দিকে চলিলেন। মনে করিলেন, সেখানে গিয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় স্ত্রী-কন্যার অনুসন্ধান করিবেন। কিছু দূর গিয়া পথিমধ্যে দেখিলেন, খাজনার টাকা বোঝাই কতকগুলি গোরুর গাড়ি ঘেরিয়া অনেকগুলি সিপাহী চলিয়াছে। তাহাদের অধ্যক্ষ একজন গোরা। মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া, একজন সিপাহী তাড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে সহসা এক ঘুষা মারিল এবং বন্দুক কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র রিক্তহস্তে

কেবল ঘুষাটি ফিরাইয়া মারিলেন। সিপাহী মহাশয় অচৈতন্য হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। তখন তিন-চারিজন সিপাহী মহেন্দ্রকে গোরুর গাড়িতে তুলিল এবং তাঁহাকে দড়ি দিয়া উত্তমরূপে গাড়ির চাকার সঙ্গে বাঁধিয়া, খাজনা লইয়া আবার মৃদুগম্ভীরপদে চলিল।

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞায় ভবানন্দ, যে চটিতে মহেন্দ্র বসিয়াছিলেন সেই চটির দিকে যাইতেছিলেন। তাঁহারও সিপাহীদের সহিত দেখা হইল। ডাকাত বিশ্বাসে সিপাহীরা তাঁহাকেও বাঁধিয়া, গাড়িতে তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিলেন যে, মহেন্দ্র সিংহ।

সিপাহীরা পুনরায় অন্যমনস্কে কোলাহল করিতে করিতে চলিলে, ভবানন্দ কেবল মহেন্দ্র শুনিতে পান, এইরূপ স্বরে বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি, তোমার সাহায্যের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। আমি যাহা বলি, সাবধানে তাহা কর। তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ির চাকার উপর রাখ।"

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামত কাজ করিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়িটা কাটিয়া গেল। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধ।

ক্রমে গাড়িগুলি একটি জঙ্গলের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। সেই সময়ে "হরি! হরি! হরি!" শব্দ করিয়া দুই শত শস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদিগকে ঘিরিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া সত্বর গাড়ির কাছে আসিলেন। এমন সময়ে ভবানন্দ হঠাৎ সাহেবের কোমর হইতে অসি কাড়িয়া লইয়া এক আঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

সহসা অধ্যক্ষকে ছিন্নশির দেখিয়া, সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। খাজনার টাকা দস্যুদের করতলগত হইল।...

মহেন্দ্র অনতিদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভবানন্দ তাঁহার নিকটে

গেলেন। মহেন্দ্র ভবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কে?"

ভবানন্দ বলিলেন, "তোমার তাতে প্রয়োজন কি?"

মহেন্দ্র। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আমি আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবানন্দ। সে বোধ যে তোমার আছে, এমন বুঝিলাম না—অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে—জমিদারের ছেলে, দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলা হনুমান!

মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন, "এ যে কুকাজ—ডাকাতি।"

ভবানন্দ। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।

এই বলিয়া ভবানন্দ চলিলেন। মহেন্দ্র ভবানন্দের সঙ্গে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, এরা কি রকম দস্যু?

৪

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভবানন্দ সহসা হাস্যমুখ ও প্রিয়সম্ভাষী হইয়া কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিলেন না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে?"

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন—

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "এ তো দেশ, এ তো মা নয়—"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা—"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তবে আবার গাও।"

ভবানন্দ আবার গায়িলেন,—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃ্তখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।"

মহেন্দ্র দেখিলেন, দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতেছে। তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কারা?"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা সন্তান।"

মহেন্দ্র। সন্তান কি? কার সন্তান?

ভবানন্দ। মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র। ভাল—সন্তানে কি চুরি-ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবানন্দ। আমরা চুরি-ডাকাতি করি না।

মহেন্দ্র। এই তো গাড়ি লুঠিলে।

ভবানন্দ। সে কি চুরি-ডাকাতি? কার টাকা লুঠিলাম?

মহেন্দ্র। কেন? রাজার।

ভবানন্দ। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা কি?

মহেন্দ্র। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন্ দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।

ভবানন্দ। অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি—আজিও দেখিলাম।

মহেন্দ্র। ভাল ক'রে দেখনি, একদিন দেখিবে।

ভবানন্দ। না হয় দেখিলাম, একবার বই তো আর দুইবার মরিব না।

মহেন্দ্র। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কি?

ভবানন্দ। মহেন্দ্র সিংহ, তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা, তুমিও তা। কেবল দুধ-ঘির যম। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য নষ্ট হয় না? কোন্ দেশের এমন দুর্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল-কুকুর খায়, মড়া খায়? সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্তও যায়। এ নেশাখোরদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?

মহেন্দ্র। তাড়াবে কেমন ক'রে?

ভবানন্দ। মেরে।

মহেন্দ্র। তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে নাকি?

দস্যু গায়িল—"সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,

অবলা কেন মা এত বলে!"

মহেন্দ্র। কিন্তু দেখিতেছি, তুমি একা।

ভবানন্দ। কেন? এখনি তো দু'শ লোক দেখিয়াছ।

মহেন্দ্র। তাহারা কি সকলে সন্তান ?

ভবানন্দ। সকলেই সন্তান।

মহেন্দ্র। আর কত আছে ?

ভবানন্দ। এমন হাজার হাজার, ক্রমে আরও হবে।

মহেন্দ্র। না হয় দশ-বিশ হাজার হ'ল, তাতে কি মুসলমানকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে ?

ভবানন্দ। পলাশীতে ইংরেজের ক'জন ফৌজ ছিল ?

মহেন্দ্র। ইংরেজ আর বাঙ্গালীতে ?

ভবানন্দ। নয় কিসে ? গায়ের জোরে কত হয়—গায়ে জিয়াদা জোর থাকিলে গোলা কি জিয়াদা ছোটে ?

মহেন্দ্র। তবে ইংরেজ-মুসলমানে এত তফাৎ কেন ?

ভবানন্দ। ইংরেজ প্রাণ গেলেও পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পলায়—শরবত খুঁজিয়া বেড়ায়। তার পর, ইংরেজদের জিদ আছে—যা ধরে, তা করে।

মহেন্দ্র। তোমাদের এ সব গুণ আছে ?

ভবানন্দ। না। কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস করিতে হয়।

মহেন্দ্র। তোমরা কি অভ্যাস কর ?

ভবানন্দ। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্য। কার্য উদ্ধার হইলে, আমরা আবার গৃহী হইব। আমাদেরও স্ত্রী-কন্যা আছে। আমরা মায়া কাটাই না—আমরা ব্রত রক্ষা করি। তুমি সন্তান হইবে ?

মহেন্দ্র। আমার স্ত্রী-কন্যার সংবাদ না পাইলে আমি কিছু বলিতে পারি না।

ভবানন্দ। চল, তবে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিবে চল।

এই বলিয়া দুইজনে চলিলেন; ভবানন্দ আবার "বন্দে মাতরম্"

গায়িতে লাগিলেন। মহেন্দ্রও সঙ্গে গায়িলেন—দেখিলেন যে, গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আইসে। তখন মহেন্দ্র বলিলেন, "যদি স্ত্রী-কন্যা ত্যাগ না করিতে হয়, তবে এ ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও।"

ভবানন্দ। তুমি যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হইবে না—ব্রতের সফলতা পর্যন্ত তাহাদের মুখদর্শন নিষেধ।

মহেন্দ্র। আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।

৫

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই জনহীন কানন এখন আলোকময়—আনন্দময়। সেই আনন্দময় প্রভাতে, আনন্দময় কাননে, "আনন্দমঠে" সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। এমন সময়ে ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া সেখানে আসিলেন। সন্ধ্যাহ্নিক শেষ হইলে, ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্য বদনে মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা, দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী-কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছি। চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্র দেখিলেন, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। সেখানে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্তক মূর্তি সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্তি—লক্ষ্মী-সরস্বতীর অধিক সুন্দরী ও ঐশ্বর্যান্বিতা। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর অতি ভীত স্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ?"

মহেন্দ্র। দেখিয়াছি। কে উনি ?

ব্রহ্মচারী। মা।

মহেন্দ্র। মা কে ?

ব্রহ্মচারী। আমরা যাঁর সন্তান।

মহেন্দ্র। কে তিনি ?

ব্রহ্মচারী। সময়ে চিনিবে। বল—বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে ?"

ব্রহ্মচারী। মা—যা ছিলেন। ইঁহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথে আইস।" ব্রহ্মচারী স্বয়ং অগ্রে অগ্রে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকারপ্রায় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেখানে ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ, মা যা হইয়াছেন।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন, "কালী !"

ব্রহ্মচারী। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়া। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা !

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দরদর ধারা পড়িতে লাগিল। বলিলেন, "বল—বন্দে মাতরম্।"

"বন্দে মাতরম্" বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই পথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় এক
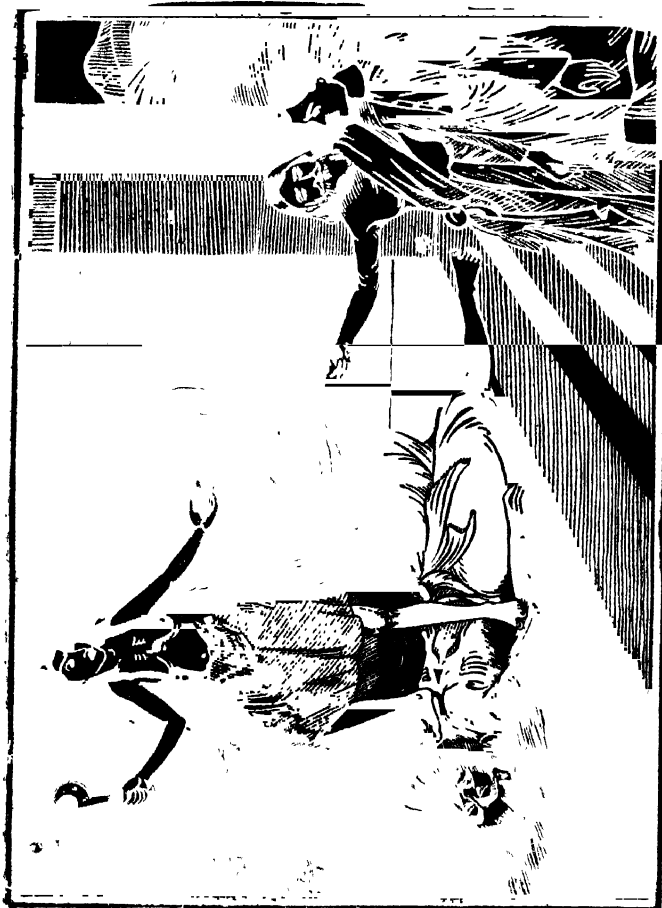
মা যা হইয়াছেন

সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃ-সূর্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক্ হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। মহেন্দ্র দেখিলেন, এক মর্মরপ্রস্তরনির্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।—এস, আমরা মাকে প্রণাম করি।"

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদগদ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব ?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্ত্রী-কন্যা কোথায় ? তাহাদের একবারমাত্র দেখিয়া বিদায় দিব।"

ব্রহ্মচারী। কেন বিদায় দিবে ?

মহেন্দ্র। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব।

ব্রহ্মচারী। যে পথে এখানে আসিলে, সেই পথে মন্দিরের বাহিরে যাও। মন্দিরদ্বারে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিতে পাইবে।

৬

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী কাঁদিয়া লুটিয়া পড়িলেন। মহেন্দ্র আরও কাঁদিলেন। কাঁদা-কাটার পর চোখ মুছিয়া উভয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন, এখন কোথায়

মা যা হইবেন

যাই ? কল্যাণী বলিলেন, "বাড়ীতে বিপদ বিবেচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বাড়ীর অপেক্ষা বাহিরে বিপদ অধিক। তবে চল, বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই।" মহেন্দ্রেরও ইচ্ছা, কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া, কোন প্রকারে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, পরম রমণীয় অপার্থিব পবিত্রতাযুক্ত মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুইজন কন্যা কোলে তুলিয়া পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে বহিতেছে; তাঁহারা বিশ্রামের জন্য এক বৃক্ষমূলে বসিয়া ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

দুঃখের দিনে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী একটি কৌটায় কিছু বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সেই ক্ষুদ্র কৌটাটি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এখন কথা বলিতে বলিতে তিনি সেই কৌটাটি মাটিতে রাখিলেন। কথায় কথায় উভয়েই অন্যমনস্ক হইলেন। এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা তুলিয়া লইল। কেহই তাহা দেখিলেন না।

সুকুমারী মনে করিল, এটি বেশ খেলিবার জিনিস। কৌটাটি দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটি খুলিয়া গেল—বড়িটি পড়িয়া গেল। তখন বড়িটি তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিল। সেই সময় তাহার উপর মার নজর পড়িল।

"কি খাইল! কি খাইল! সর্বনাশ!" বলিয়া কল্যাণী কন্যার মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিয়া বড়িটি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু মেয়ে যে দুই-এক ঢোক গিলিয়াছিল, তাহারই গুণে কিছু ছটফট করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল—শেষে কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, "আর দেখ কি? যে পথে সুকুমারী

চলিল, আমাকেও সেই পথে যাইতে হইবে।" এই বলিয়া কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া মুহূর্তমধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, "কি করিলে—কল্যাণী, ও কি করিলে?" কল্যাণী কিছু উত্তর না করিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। মহেন্দ্র আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল। তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণে গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে সময় সে দিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুনা গেল,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দসৌরে।"

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল; তিনি মোহভরে সেই অপূর্ব সঙ্গীত শুনিলেন। শুনিয়া মোহভরে ডাকিতে লাগিলেন,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কাতরচিত্তে ঈশ্বরমাত্র সহায় মনে করিয়া মহেন্দ্রও ডাকিলেন,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

ক্রমে ক্রমে কল্যাণীর কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, চক্ষু নিমীলিত হইল। তখন পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কানন বিকম্পিত করিয়া মহেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

সেই সময়ে কে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে তেমনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

৭

এদিকে রাজধানীতে বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রব উঠিল যে, রাজসরকার হইতে কলিকাতায় যে খাজনা চালান যাইতেছিল, সন্ন্যাসীরা তাহা মারিয়া লইয়াছে। তখন রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসী ধরিতে সিপাহী বরকন্দাজ ছুটিল।

সেই নদীতীরে বৃক্ষতলে কল্যাণী পড়িয়া আছেন, মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ সাশ্রুলোচনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, একজন জমাদার সিপাহী লইয়া এমন সময়ে সেইখানে উপস্থিত। তাহারা বিশেষ কোন কথাবার্তা না বলিয়াই দুইজনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন—

"ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্ধর গমনবিলম্বন অতিবিধুরা সুকুমারী॥"

নগরে পৌঁছিলে তাঁহারা কোতোয়ালের নিকট নীত হইলেন। কোতোয়াল রাজসরকারে এত্তালা পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে সম্প্রতি ফাটকে রাখিলেন।···

রাত্রি উপস্থিত। কারাগারমধ্যে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "নিশ্চিন্ত থাক যে, সন্তানগণ তোমার স্ত্রীর সৎকার করিয়াছে—কন্যাকে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে। আজি রাত্রেই তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।" এই কথা বলিতে বলিতেই কারাগারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল, "মহেন্দ্র সিংহ কাহার নাম?" মহেন্দ্র বলিলেন, "আমার নাম।" আগন্তুক বলিল, "তোমার খালাসের হুকুম হইয়াছে—যাইতে পার।"

মহেন্দ্র প্রথমে মনে করিলেন, মিথ্যাকথা। পরীক্ষার্থ বাহির হইলেন। কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিল, "মহারাজ, আপনিও কেন যান না?"

সত্যানন্দ। কে? ধীরানন্দ? প্রহরী হইলে কি প্রকারে?

ধীরানন্দ। ভবানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। যে খাঁ সাহেব পাহারায় ছিলেন, তাঁহাকে ধুতুরামিশান সিদ্ধি সেবন করাইয়াছি। তিনি ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন। এই জামাজোড়া পাগড়ি বর্শা যাহা আমি পরিয়া আছি, সে তাঁহারই।

সত্যানন্দ। তুমি উহা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এরূপে যাইব না।—আজ সন্তানের পরীক্ষা।

এমন সময় মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিলে যে?"

মহেন্দ্র। আপনি সিদ্ধপুরুষ। আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।

সত্যানন্দ। তবে থাক, অন্য প্রকারে মুক্ত হইব।

ধীরানন্দ বাহিরে গেলেন।

সন্তানেরা সেই রাত্রেই রাজকারাগার ভাঙ্গিয়া রক্ষিবর্গকে মারিয়া ফেলিল এবং সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে মুক্ত করিল।

৮

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য জীবানন্দের কানেও সে গান গেল। তিনি দেখিলেন, প্রভুকে সিপাহীরা ধরিয়া লইয়া যাইতেছে—প্রভু গান গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন।

জীবানন্দ মহাপ্রভু সত্যানন্দের সঙ্কেত-সকল বুঝিতেন।

"ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী"—ভাবিয়া চিন্তিয়া জীবানন্দ নদীর ধারে ধারে চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে

নদীতীরে দেখিলেন যে, এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর এক জীবিতা শিশুকন্যা। ভবানন্দ ঠাকুর এইখানেই কোথায় আছেন, তিনি স্ত্রীলোকটির সৎকার করিবেন, এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং নিকটবর্তী জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম ভৈরবীপুর। লোকে বলিত ভরুইপুর।

একটি বৃহৎ আম্রকাননমধ্যে একটি ছোট বাড়ী। সব ঘরের দাওয়ায় একটা একটা চরকা আছে; কিন্তু বাড়ীতে বড় লোক নাই। জীবানন্দ সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই একটা ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া চরকা লইয়া ঘেনর-ঘেনর আরম্ভ করিলেন। তখন ঘরের ভিতর হইতে একটি সতের কি আঠার বৎসরের পরমা সুন্দরী মেয়ে বাহির হইয়া বলিল, "এ কি এ? দাদা, চরকা কাটো কেন? মেয়ে কোথা পেলে?" দাদা, তোমার মেয়ে হয়েছে নাকি—আবার বিয়ে করেছ নাকি?"

জীবানন্দ মেয়েটি আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া তাহাকে কিল মারিতে উঠিলেন, বলিলেন. "বাঁদরী, আমার আবার মেয়ে, আমাকে হেঁজিপেঁজি পেলি নাকি? ঘরে দুধ আছে?"

তখন সে যুবতী বলিল, "দুধ আছে বই কি, খাবে?"

জীবানন্দ বলিলেন, "হাঁ, খাব।"

যুবতী ব্যস্ত হইয়া দুধ জ্বাল দিতে গেল। মেয়েটি জীবানন্দের কোলে কাঁদিতেছিল, কিন্তু যুবতীর কোলে গিয়া আর কাঁদে না—বোধ হয় যুবতীকে দেখিয়া মা মনে করিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ বলিলেন, "ও নিমি! ও পোড়ারমুখী! ও হনুমানী! তোর এখনও দুধ জ্বাল হ'ল না?" নিমি বলিল, "হয়েছে।" এই বলিয়া সে পাথরবাটিতে দুধ ঢালিয়া জীবানন্দের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিল। জীবানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ

করিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা করে যে, এই তপ্ত দুধ তোর গায়ে ঢালিয়া দিই—তুই কি মনে করেছিস্, আমি খাব নাকি ?"

নিমি জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কে খাবে ?"

জীবানন্দ। ঐ মেয়েটি খাবে। নে মেয়েকে দুধ খাওয়া।

নিমি তখন আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া, মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া, ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে লাগিল।

নিমি বলিল, "হ্যাঁ দাদা, আমায় মেয়েটি দেবে ?"

জীবানন্দ। তা নে, নিয়ে মরগে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। আমি চল্লুম এখন—

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না! বেলা হয়েছে যে। আমার মাথা খাও, দুটি খেয়ে যাও।

জীবানন্দ। তোর মাথাও খাব, আবার দুটি খাব ? দুই তো পেরে উঠবো না দিদি। মাথা রেখে দুটি ভাত দে।

নিমি তখন পিঁড়ি পাতিয়া, জলছড়া দিয়া, জায়গা মুছিয়া পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলাইয়ের দাল, জঙ্গুলে ডুমুরের দালনা, পুকুরের রুইমাছের ঝোল এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন, "নিমাই দিদি, কে বলে মন্বন্তর ? তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসে নি ?"

নিমি বলিল, "মন্বন্তর আসবে না কেন, বড় মন্বন্তর, তা আমরা দুটি মানুষ, ঘরে যা আছে, লোককে দিই থুই ও আপনারা খাই।"

এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গপগপ, টপটপ, সপসপ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। নিমাই শুধু আপনার ও স্বামীর জন্য রাঁধিয়াছিল, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিল, পাথর শূন্য দেখিয়া

জীবানন্দ ও নিমাই

অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জনগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিল। জীবানন্দ সে সকলই উদরনামক বৃহৎ গর্তে প্রেরণ করিলেন। তখন নিমাই বলিল, "দাদা, আর কিছু খাবে? একটা পাকা কাঁটাল আছে।"

নিমাই কাঁটাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁটালটিকেও ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল, "দাদা, আর কিছু নাই।"

দাদা বলিলেন, "তবে যা, আর একদিন আসিয়া খাইব।"

নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিতে দিতে বলিল, "দাদা, আমার একটি কথা রাখবে?"

জীবানন্দ। কি?

নিমাই। আমার মাথা খাও—পায়ে পড়ি।

জীবানন্দ। তোর মাথাও খাই—তুই পায়েও পড়্, কিন্তু কি বল্।

নিমাই। একবার বউকে ডাক্‌বো?

জীবানন্দ আঁচাইবার গাড়ু তুলিয়া নিমির মাথায় মারিতে উদ্যত; বলিলেন, "আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে, আর আমি একদিন তোর চাল-দাল ফিরিয়া দিয়া যাইব। তুই বাঁদরী, তুই পোড়ারমুখী, তুই যা না বলবার, তাই আমাকে বলিস্।—আমি চল্লুম।"

নিমাই গিয়া দ্বারের কপাট রুদ্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, "আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বৌয়ের সঙ্গে না দেখা ক'রে তুমি যেতে পারবে না।"

নিমাইয়ের পীড়াপীড়িতে জীবানন্দ তাঁহার স্ত্রী শান্তির সহিত দেখা না করিয়া পারিলেন না।

স্বামী-স্ত্রীতে দেখা হইল। কথা শেষ না হইতেই জীবানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কেন দেখা করিলাম!"

শান্তি। কেন করিলে—তোমার তো ব্রতভঙ্গ করিলে?

জীবানন্দ। ব্রতভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে।

শান্তি কিছুকাল কথা কহিতে পারিল না। তার পর বলিল, "দেখ, প্রায়শ্চিত্ত কি, তা আমি জানি। এক অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত—শত অপরাধেও কি তাই?"

জীবানন্দ বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কথা কেন?"

শান্তি। এক ভিক্ষা আছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিলেন, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিব না। মরিবার তত তাড়াতাড়ি নাই।"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

জীবানন্দ। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধানে যাইব।···

এদিকে ভবানন্দ অশ্বারোহণে নগরের দিকে চলিয়াছেন। যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল। সেই পথিপার্শ্বে নদীকূলে স্ত্রী-মূর্তি শয়ান দেখিলেন। দেখিলেন, জীবনলক্ষণ কিছু নাই। শূন্য বিষের কৌটা দেখিয়া বুঝিলেন, স্ত্রীলোকটি বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ সেই শবের নিকট বসিলেন। অনেক প্রকার পরীক্ষা করিলেন। বুঝিলেন, এখনও সময় আছে। বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলির রস কিছু শবের মুখে ও কিছু নাসিকায় প্রবেশ করাইয়া দিলেন। অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন। পুনঃপুনঃ এইরূপ করিতে করিতে অল্পে অল্পে কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্ধ-জীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া নগরে গেলেন এবং সেখানে তাঁহার এক ঠানদিদির বাড়ীতে কল্যাণীকে রাখিলেন।

৯

শান্তির অল্পবয়সে, অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে অন্য স্ত্রীলোক কেহ ছিল না। এইরূপে শৈশবে নিয়ত পুরুষসাহচর্যের প্রথম ফল এই হইল যে, শান্তি ছেলের মত কোঁচা করিয়া কাপড় পড়িতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, শান্তি একটু বড় হইলেই ছাত্রেরা যাহা পড়িত, শান্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া শুনিয়া শান্তির পিতা শান্তিকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই-একখানা সাহিত্য পড়াইলেন। তার পর সব গোলমাল হইয়া গেল। পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

তখন শান্তি নিরাশ্রয়। টোল উঠিয়া গেল। পিতার একজন ছাত্র তাহাকে দয়া করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। ইনিই জীবানন্দ।

জীবানন্দ পিতামাতার অনুমতি লইয়া শান্তিকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু বিবাহের পর সকলেই বুঝিলেন, কাজটা ভাল হয় নাই। শান্তি কিছুতেই মেয়ের মত কাপড় পরিল না। কিছুতেই চুল বাঁধিল না। সে বাটীর ভিতর থাকিত না; পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত। শ্বশুর-শাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভৎর্সনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিলেন। পীড়াপীড়িতে শান্তি বড় জ্বালাতন হইল। একদিন দ্বার খোলা পাইয়া শান্তি কাহাকে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

তখন বাঙ্গালা জুড়িয়া দলে দলে সন্ন্যাসী ফিরিত। শান্তি বাচ্চা সন্ন্যাসী সাজিয়া একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিশিল। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দেশ-বিদেশে পর্যটন করিল এবং ব্যায়াম, লড়াই ও অস্ত্রবিদ্যা শিখিল।

ক্রমশঃ তাহার যৌবনলক্ষণ দেখা দিল। এখন স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা আসিয়া আপনিই উপস্থিত হইল। শান্তি সন্ন্যাসিসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না—জাতি যাইবে। শান্তি বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ শান্তির অনুবর্তী হইলেন। পথে শান্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?" শান্তি সকল সত্য বলিল। শুনিয়া জীবানন্দ বলিলেন, "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।"

মাকে বুঝাইয়া জীবানন্দ শান্তিকে লইয়া ভৈরবীপুরে গেলেন। সেখানে তাঁহার ভগিনী নিমাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল। ভগিনীপতি একটু ভূমি দিলেন। জীবানন্দ একখানি কুটীর নির্মাণ করিয়া শান্তিকে লইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পরে সহসা জীবানন্দ সত্যানন্দের হাতে পড়িয়া, সন্তানধর্ম গ্রহণপূর্বক শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পরিত্যাগের পর তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ নিমাইয়ের কৌশলে ঘটিল।...

জীবানন্দ চলিয়া গেলে, শান্তি আপনার কুটীরে ফিরিয়া আসিল। একখানি বস্ত্র গেরিমাটিতে বেশ করিয়া রঙ করিল। বস্ত্র রঙ করিতে, শুকাইতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা হইলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মাথার আগুল্ফলম্বিত কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিল। অবশিষ্ট বিনাইয়া জটা তৈয়ারি করিল। তার পর গৈরিক বসনখানি পরিধান করিয়া এক বৃহৎ হরিণচর্মে কণ্ঠ হইতে জানু পর্যন্ত শরীর আবৃত করিল। এইরূপে সন্ন্যাসিবেশে সজ্জিত হইয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে শান্তি বাটী হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারে গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

১০

পরদিন সায়াহ্নে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমার কন্যা জীবিত আছে।"

মহেন্দ্র। কোথায় মহারাজ?

সত্যানন্দ। তা শুনিবার আগে একটা কথার উত্তর দাও। তুমি সন্তানধর্ম গ্রহণ করিবে?

মহেন্দ্র। তাহা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি। কিন্তু সন্তান-মাত্রেই কি স্ত্রী-পুত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে?

সত্যানন্দ। সন্তান দ্বিবিধ—দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুঠের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত, তাহারা সর্বত্যাগী। তাহারা সম্প্রদায়ের কর্তা। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্যের অধিকারী হইবে না।

সত্যানন্দ কথাবার্তা সমাপনান্তে মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব শোভাময় প্রকাণ্ডাকার চতুর্ভুজ মূর্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। মন্দিরে আর একজন উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু 'হরে মুরারে' শব্দ করিতেছিল। সে গাত্রোত্থান করিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দীক্ষিত হইবে?"

সে বলিল, "আমাকে দয়া করুন।"

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা যথাবিধি স্নাত, সংযত এবং অনশনে আছ তো?"

উভয়ে। আছি।

সত্যানন্দ। তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর, সন্তানধর্মের নিয়ম-সকল পালন করিবে—যতদিন না মাতার উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহধর্ম পরিত্যাগ করিবে।

উভয়ে। করিব।

সত্যানন্দ। যাহা উপার্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব-ধনাগারে দিবে?

উভয়ে। দিব।

সত্যানন্দ। তোমরা জাতি ত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান একজাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই।

উভয়ে। আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্যানন্দ। যদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়?

উভয়ে। প্রাণত্যাগ করিব।

সত্যানন্দ। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা গাও, "বন্দে মাতরম্।"

উভয়ে মাতৃস্তোত্র গান করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।

দীক্ষাশেষে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। বলিলেন, "দেখ বৎস, তোমার দ্বারা মার মহৎকার্য অনুষ্ঠিত হইবে। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও। স্বধামে থাকিয়াই তোমাকে সন্ন্যাসধর্ম পালন করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন। কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "এখন আমাদের আশ্রয় নাই—কোন গড় নাই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকারে। আমার ইচ্ছা, সেইখানে একটি গড় প্রস্তুত করি। ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান

সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। তুমি তাহাদের দ্বারা গড় এবং উত্তম লৌহনির্মিত একটি ঘর প্রস্তুত করাইবে। সেখানে সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণে পূর্ণ সিন্দুক-সকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সেই অর্থের দ্বারা কার্য নির্বাহ করিবে। আমি নানাস্থান হইতে কৃতকর্মা শিল্পি-সকল আনাইতেছি। তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিয়া কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এই জন্য তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।”

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন।

মহেন্দ্র বিদায় হইলে, সেইদিন দীক্ষিত দ্বিতীয় শিষ্য আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার কথাবার্তায় সন্তুষ্ট হইয়া সত্যানন্দ বলিলেন, “তোমার নবীন বয়স, অতএব তুমি নবীনানন্দ নাম গ্রহণ কর।—তোমার পূর্বে কি নাম ছিল?”

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্মা।

সত্যানন্দ। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।

এই বলিয়া সত্যানন্দ শিষ্যের কালো কুচকুচে দেড় হাত লম্বা দাড়ি বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল। সত্যানন্দ বলিলেন, “ছি মা, আমার সঙ্গে প্রতারণা!”

শান্তি তখন দুই চোখ ঢাকা দিয়া কিছুক্ষণ অধোবদনে বসিয়া রহিল।—পরে বলিল, “প্রভু, দোষই বা কি করিয়াছি? স্ত্রী-বাহুতে কি কখন বল থাকে না? সন্তানদিগের বাহুবল আপনি কখন পরীক্ষা করিয়া থাকেন?”

সত্যানন্দ। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ এক ইস্পাতের ধনুক আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন, “এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার

তারের গুণ দিতে হয়। যে গুণ দিতে পারে, সেই প্রকৃত বলবান।

শান্তি। সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ?

সত্যানন্দ। না, চারিজন মাত্র।

শান্তি। কে কে ?

সত্যানন্দ। আমি, জীবানন্দ, ভবানন্দ ও জ্ঞানানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, তীর লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল। সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

সহসা মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের ন্যায় স্মৃতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রভাসিত করিল। তিনি বলিলেন, "তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী ?"

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। সত্যানন্দ বলিলেন, "কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে ?"

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিয়া উন্নতমুখে বলিল, "পাপাচরণ কি প্রভু ? আমি স্বামীর সহধর্মিণী, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।"

শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া সত্যানন্দ প্রীত হইলেন। বলিলেন, "ভাল, তোমায় দিনকত পরীক্ষা করিয়া দেখি।"

শান্তি বলিল, "আনন্দমঠে আমি থাকিতে পাইব কি ?"

সত্যানন্দ। আজ আর কোথা যাইবে ?

এই বলিয়া, পরে আশীর্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় দিলেন। তার পর তিনি কিছুদিনের জন্য তীর্থযাত্রা করিলেন।

১১

সে-রাত্রি শান্তি মঠে থাকিবার অনুমতি পাইয়া জীবানন্দের ঘর খুঁজিয়া বাহির করিল। সেখানে তখন কেউ ছিল না। শান্তি ঘরে

প্রবেশ করিয়া, জীবানন্দের একখানি পুথি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ আসিলেন। শান্তির পুরুষবেশ, তথাপি দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "এ কি এ? শান্তি?"

শান্তি ধীরে ধীরে পুথিখানি রাখিয়া, জীবানন্দের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "শান্তি কে মহাশয়?—আমি নবীনানন্দ গোস্বামী।"

জীবানন্দ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "এ নূতন রঙ্গ বটে। তার পর নবীনানন্দ, এখানে কি মনে ক'রে এসেছ?"

শান্তি। ভদ্রলোককে প্রথম আলাপে 'আপনি' 'মহাশয়' ইত্যাদি সম্বোধন করিতে হয়। তবে আপনি কেন আমাকে তুমি তুমি করিতেছেন?

জীবানন্দ গলায় কাপড় দিয়া জোড়হাতে বলিলেন, "যে আজ্ঞে। এখন কি জন্য ভরুইপুর হইতে এ দীনভবনে মহাশয়ের শুভাগমন হয়েছে?"

শান্তি। আমি সন্তানধর্ম গ্রহণ করিতে আসিয়া আজ দীক্ষিত হইয়াছি।

জীবানন্দ। আ সর্বনাশ! সত্য নাকি?

শান্তি। সর্বনাশ কেন? আপনিও দীক্ষিত।

জীবানন্দ। তুমি যে স্ত্রীলোক।

শান্তি। সে কি? এমন কথা কোথা পাইলেন?

জীবানন্দ। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ব্রাহ্মণী স্ত্রীজাতীয়।

শান্তি। ব্রাহ্মণী? আছে নাকি?

জীবানন্দ। ছিল তো জানি।

শান্তি। আপনার বিশ্বাস যে, আমি আপনার ব্রাহ্মণী?

জীবানন্দ (জোড়হাতে)। আজ্ঞে হাঁ মহাশয়!

শান্তি। যদি এমন হাসির কথা আপনার মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে আপনার আলাপও অকর্তব্য।

এই বলিয়া শান্তি পুনরায় পুস্তকে মন দিল। পরাস্ত হইয়া জীবানন্দ পৃথক্ শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলেন।

১২

এই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস কোম্পানীর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল। সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে ওয়ারেন হেষ্টিংস বিকম্পিত হইলেন। তিনি প্রথমে ফৌজদারী সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফৌজদারী সিপাহীর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তাহারা হরিনাম শুনিলেই পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায় ওয়ারেন হেষ্টিংস কাপ্তেন টমাস্ নামক একজন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া একদল কোম্পানীর সৈন্য বিদ্রোহ নিবারণের জন্য প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন টমাস্ শিকার বড় ভালবাসিতেন। তিনি একদিন শিকারে বাহির হইয়া, পথ হারাইয়া, একা অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক বৃহৎ বৃক্ষতলে এক নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে। সাহেব বিস্মিত হইলেন। তিনি দেশী ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন, "টুমি কে ?"

সন্ন্যাসী বলিল, "আমি সন্ন্যাসী।"

কাপ্তেন। হামি টৌমায় গুলি করিয়া মাড়িব।

সন্ন্যাসী। মার।

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলি মারিবেন কিনা, এমন সময় বিদ্যুদ্বেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী একটানে জটা খুলিয়া ফেলিল। সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী-মূর্তি। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "সাহেব,

সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী-মূর্তি।

আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না। তুমি আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।—আমাদের বাগানে বেশ মর্তমান কলা হয়, খাবে ?”

সাহেব। কলা থাইটে উট্টম জিনিস। এখন আছে ?

শান্তি। নে, তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জেতের সঙ্গেও কেউ কথা কয় !

শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল এবং ক্ষিপ্রচরণে বনমধ্যে কোথায় প্রবিষ্ঠ হইল। সাহেব কিছু পরে শুনিতে পাইলেন, স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইতেছে—

“ এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !”…

১৩

ভবানন্দ একদিন নগরে তাঁহার ঠানদিদি গৌরী দেবীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি এইরূপ মাঝে মাঝে আসিয়া কল্যাণীকে ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি পড়াইয়া যাইতেন। তিনি কল্যাণীকে দেখা অবধি তাঁহার রূপে বিমোহিত হইয়াছিলেন। সে-দিন তিনি কল্যাণীকে তাহা জানাইলে, কল্যাণী তাঁহাকে ব্রতচ্যুত অধর্মী বলিয়া ভৎ‍র্সনা করিয়া বিদায় করিলেন।

ভবানন্দ ভাবিতে ভাবিতে মঠে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রি হইল। মঠে না গিয়া ভবানন্দ গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একস্থানে একটি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ছিল। তাহার একটি অপেক্ষাকৃত অভগ্ন ও পরিষ্কৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া ভবানন্দ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত, জনশূন্য, অন্ধকার, দুর্ভেদ্য, নীরব। ভবানন্দের পক্ষে তখন যেন পৃথিবী নাই। তিনি কপালে হাত দিয়া

ভাবিতেছিলেন ; মনে মনে বলিতেছিলেন, “যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্য হইবে। আমার মরণ শ্রেয়ঃ। ধর্মত্যাগী ? ছি !—মরিব।” এমন সময়ে পেচক মাথার উপর গম্ভীর শব্দ করিল। ভবানন্দ তখন মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “আমায় ধর্মে মতি দাও, আমায় পাপ হইতে বিরত কর। ধর্মে,—হে গুরুদেব, ধর্মে যেন আমার মতি থাকে।”

তখন সেই ভীষণ কাননমধ্য হইতে অতি মধুর অথচ গম্ভীর মর্মভেদী স্বরে কেহ বলিল, “ধর্মে তোমার মতি থাকিবে—আশীর্বাদ করিলাম।”

ভবানন্দের শরীরে রোমাঞ্চ হইল। “এ কি এ ? এ যে গুরুদেবের কণ্ঠ ! মহারাজ, কোথায় আপনি ? এ-সময়ে দাসকে দর্শন দিন।”

কিন্তু কেহ দর্শন দিল না—কেহ উত্তর করিল না। ভবানন্দ পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন—উত্তর পাইলেন না। এদিক্-ওদিক্ খুঁজিলেন—কোথাও কেহ নাই।

রজনী-প্রভাতে ভবানন্দ মঠে আসিলেন। কর্ণে প্রবেশ করিল—“হরে মুরারে ! হরে মুরারে !” চিনিলেন, সত্যানন্দের কণ্ঠ। বুঝিলেন, প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

১৪

শান্তি অতি নিবিড় বনমধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া সারঙ্গ লইয়া মৃদু মৃদু রবে গায়িতেছিল—

“প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।”

ক্রমশঃ সে গায়িল—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়-হৃদয়-দর্শিতপশুঘাতম্
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

তখন বাহির হইতে কে অতি গম্ভীর রবে গায়িল—

"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশব ধৃতকল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

শান্তি ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া সত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিল।

সত্যানন্দ আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার কুশল হইবে। মা, আমি তোমার পুত্র, সন্তানকে স্নেহ কর, যাহাতে কার্যোদ্ধার হয় তাহা কর, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা কর, আপনার প্রাণরক্ষা কর, আমার কার্যোদ্ধার হইবে।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" গায়িতে গায়িতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

১৫

ক্রমে সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সত্যানন্দ আসিয়াছেন, তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন এক জ্যোৎস্না-রাত্রিতে নদীসৈকতপার্শ্বে বৃহৎ কাননমধ্যে দশ সহস্র সন্তান সমবেত হইল।

সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন। তখন সেই দশ সহস্র সন্তানমস্তক শ্যামল ভূতৃণমে প্রণত হইল।

সত্যানন্দ তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "সন্তানগণ, টমাস্‌নামা একজন বিধর্মী দুরাত্মা বহুতর সন্তান নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্যে বধ করিব। তোমরা কি বল?"

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "পদচিহ্নের দুর্গ হইতে কামান আসিতেছে—পৌঁছিলেই আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। ঐ দেখ, প্রভাত হইতেছে—ও কি ও—"

"গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্!" অকস্মাৎ চারিদিকে বিশাল কাননে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল।

জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "তোপ ইংরেজের।"

জীবানন্দ গাছ হইতে নামিলে, সত্যানন্দ তাঁহাকে বলিলেন, "দশ হাজার সন্তান উপস্থিত আছে; কি করিতে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।"

জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। একবার নবীনানন্দের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়নেঙ্গিতে কি বলিলেন, কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। তখন সেই দশ সহস্র সন্তান এককণ্ঠে নদী, কানন, আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, তোপের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া গায়িল—

"জয় জগদীশ হরে
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।"

এমন সময়ে ইংরেজের গোলা আসিয়া সন্তানদের উপর পড়িতে লাগিল। তখন সত্যানন্দ অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তোপ কত দূর?"

উপর হইতে নবীনানন্দ বলিল, "এই কাননের অতি নিকটে।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দশ সহস্র সন্তান, তোপ কাড়িয়া লও।"

তখন সেই দশ সহস্র সন্তান অতিবেগে জীবানন্দের অনুবর্তী হইল। ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্তী হইলেন। উচ্চনিনাদে সেই দশ সহস্র

সন্তান "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে অতি দ্রুতবেগে তোপশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তোপের মুখে সন্তানসেনা কতক্ষণ টিকে? তাহাদের অধিকাংশই পলাইতে আরম্ভ করিল।

. ইহা কাপ্তেন টমাস্ দেখিতে পাইলেন। তিনি কাপ্তেন হে নামা একজন সহযোগীকে বলিলেন, "আমি দুই-চারিশত সিপাহী লইয়া এই উপস্থিত ভগ্ন বিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও।" কাপ্তেন হে তাহাই করিলেন।

"অতি দর্পে হতা লঙ্কা।"—চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন, ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য প্রায় সবই গেল, তখন তিনি হতাবশিষ্ট সন্তান-সেনা লইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। সে আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক সিপাহীরা সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল। কাপ্তেন টমাস্ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ভবানন্দ নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিয়া অনুচরবর্গকে বলিলেন, "ইহাকে একটা ঘোড়ার উপর তুলিয়া লইয়া চল, আমরা জীবানন্দ গোস্বামীর আনুকূল্যে যাই।"...

জীবানন্দের সন্তানসেনা ভগ্নোদ্যম, তাহারা পলায়নে উদ্যত। তোপের দৌরাত্ম্যে ভয়ানক সন্তানক্ষয় হইতেছিল! ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল—"গুড়ুম্ গুম্ বুম্ বুম্!" উভয় দল কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল—কোথায় আবার কামান! দেখিল, বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান দেশী গোলন্দাজ কর্তৃক চালিত হইয়া নির্গত হইতেছে। নির্গত হইয়া সেই বিরাট কামানের শ্রেণী হে সাহেবের

দলের উপরে অগ্নিবৃষ্টি করিল। সমস্ত দিনের রণে ক্লান্ত যবনসেনা প্রাণভয়ে শিহরিল। যবনেরা দেখিল, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান। তখন হে সাহেবের সর্বনাশ উপস্থিত হইল।...

শেষে এক স্থানে ২০।৩০ জন গোরাসৈন্য একত্রিত হইয়া অতি ঘোরতর রণ করিতে লাগিল। জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ, আমাদের রণজয় হইয়াছে, এই কয়জন ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই, উহাদিগকে প্রাণদান দিয়া চল আমরা ফিরিয়া যাই।" ভবানন্দ বলিলেন, "একজন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না।"

এই সময়ে একজন গোরার আঘাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল। ভবানন্দ তখন একহাতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে এক-জন গোরা কর্তৃক ভবানন্দের বাম বাহুও ছিন্ন হইল। ভবানন্দ বলিলেন, "সন্তানের জয় হউক! ভাই, আমার মৃত্যুকালে একবার 'বন্দে মাতরম্' শুনাও দেখি।"

যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে "বন্দে মাতরম্" গায়িল। অবশিষ্ট গোরাগণ নিহত হইল।

সেই মুহূর্তে ভবানন্দ "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে, মনে মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

১৬

রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে ঘিরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উৎসব করিতে লাগিল। কেবল সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য।

সত্যানন্দ বলিলেন, জগদীশ্বর আজ কৃপা করিয়াছেন, সন্তানধর্মের জয় হইয়াছে; কিন্তু এক কাজ বাকী আছে। যাহারা আমাদের উৎসবের জন্য প্রাণ দিয়াছে, চল যাই, আমরা গিয়া তাহাদের সৎকার করি। বিশেষ যে মহাত্মা আমাদিগের জন্য এই রণজয় করিয়া প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন, চল, মহান উৎসব করিয়া সেই ভবানন্দের সৎকার করি।” তখন সন্তানদল “বন্দে মাতরম্” বলিতে বলিতে নিহতদিগের সৎকার করিল।

তার পর জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মহারাজাধিরাজ, আজ্ঞা হয় তো আমরা এই কাননেই আপনার সিংহাসন স্থাপিত করি।”

সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, “ছি! আমরা কেহ রাজা নহি—আমরা সন্ন্যাসী। নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয় রাজ-মুকুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এখন তোমরা স্ব স্ব কর্মে যাও।”

তখন মহেন্দ্র ব্যতীত সকলে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, “মহেন্দ্র, এখন কার্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন তুমি আবার সংসারী হইতে পার।”

মহেন্দ্রের চক্ষে দরদরিত ধারা বহিল। মহেন্দ্র বলিলেন, “ঠাকুর, সংসারী হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী তো আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, আর কন্যা যে কোথায় তা তো জানি না। আপনি বলিয়াছেন, জীবিত আছে, ইহাই জানি।”

সত্যানন্দ তখন নবীনানন্দকে ডাকিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, “ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী—ইনি তোমার কন্যার সন্ধান বলিয়া দিবেন।”

শান্তি মহেন্দ্রকে বলিল, “আমার আশ্রমে আসুন।”

তখন মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পাদবন্দনা করিয়া শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। তথাপি শান্তি বিশ্রাম না করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

১৭

সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, "দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে।"

এ সকল কথা কল্যাণীর কানে গেল। গভীর রাত্রে কল্যাণী ধীরে ধীরে নিঃশব্দে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া বলিলেন, "দেখ ঠাকুর, আজ যেন পদচিহ্নে স্বামীর সাক্ষাৎ পাই।"

কল্যাণী লুকাইয়া লুকাইয়া অন্ধকারে পথ চলিতেছেন। লুকাইয়া যাইতে যাইতেও এক দল অতি উদ্ধত বিদ্রোহীর হাতে তিনি পড়িয়া গেলেন।

কল্যাণী তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে একজন দস্যু তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। সেই সময় আর একজন অকস্মাৎ আসিরা অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ—বয়স অতি অল্প। সে কল্যাণীকে বলিল, "তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস—কোথায় যাইবে ?"

কল্যাণী। পদচিহ্নে।

আগন্তক বিস্মিত হইল ; বলিল, "সে কি ?—পদচিহ্নে ?" এই বলিয়া আগন্তক কল্যাণীর মুখপানে সেই অন্ধকারে অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, হরে মুরারে ! চিনেছি যে, তুমি পোড়ারমুখী কল্যাণী !"

শান্তি তখন কল্যাণীকে সঙ্গে করিয়া বন্যপথে লইয়া চলিল।...

সেই রজনী প্রভাতে শান্তির সাহায্যে আনন্দমঠে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল।

বেলা এক প্রহর হইল। সেখানে শান্তি জীবানন্দ আসিয়া দেখা

দিলেন। কল্যাণী শান্তিকে বলিলেন, "আমরা আপনার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত। আমাদের কন্যাটির সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।"

জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "সে ভার আমার উপরে রহিল। আপনারা পদচিহ্নে গমন করুন—সেইখানে কন্যাকে পাইবেন।"

জীবানন্দ ভরুইপুয়ে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন। কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না। নিমাই কাঁদিয়া বলিল, "আমি মেয়ে দিব না।" জীবানন্দ নিমাইকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন। তখন সুকুমারীকে লইয়া নিমাই নিজেই পদচিহ্নে গেল।

১৮

উত্তর বাঙ্গালা সন্তানদের হস্তগত হইয়াছে। হেষ্টিংসের নিয়োগে মেজর এডওয়ার্ডস্ নামক দ্বিতীয় সেনাপতি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এডওয়ার্ডস্ দেখিলেন যে, শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন। যে দিন যেখানে ব্রিটিশ সেনার শিবির, সেই দিনের জন্য সে স্থান ব্রিটিশ সেনার অধীন—তার পরদিন ব্রিটিশ সেনা চলিয়া গেল তো অমনি চারিদিকে "বন্দে মাতরম্" গীত হইতে লাগিল। সাহেব খুঁজিয়া পান না, কোথা হইতে ইহারা পিপীলিকার মত এক রাত্রে নির্গত হইয়া, যে গ্রাম ইংরেজের বশীভূত হয়, তাহা দাহ করিয়া যায়, অথবা অল্পসংখ্যক ব্রিটিশসেনা পাইলে তৎক্ষণাৎ সংহার করে। অনুসন্ধানে সাহেব জানিলেন যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গ নির্মাণ করিয়া, সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। তখন তিনি মনে মনে এক অপূর্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমায় অদূরবর্তী নদীতীরে একটা মেলা হইবে। সন্তানগণের সকলেরই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। এডওয়ার্ডস্ বিবেচনা করিলেন যে, সহসা সেই সময়েই পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকার করিবেন। এই অভিপ্রায় করিয়া সাহেব রটনা করিলেন যে, তিনি মেলা আক্রমণ করিবেন।

তখন যেখানে যে সন্তান ছিল, সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মেলা রক্ষার জন্য ধাবিত হইল। মহেন্দ্রও ফাঁদে পা দিলেন। তিনি দুর্গে অল্পমাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া মেলায় যাত্রা করিলেন।

এ সকল হইবার আগেই জীবানন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। পথে তাঁহারা শুনিলেন যে, মেলায় সন্তানদিগের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র চলিলেন। পথে একটা টিলায় উঠিয়া বীর-দম্পতি দেখিতে পাইলেন যে, নিম্নে কিছু দূরে ইংরেজের শিবির। তখন দুইজনে কি পরামর্শ করিলেন। তার পর জীবানন্দ এক বনে লুকাইলেন। শান্তি বৈষ্ণবী-বেশে ইংরেজ-শিবিরে দর্শন দিল। তাহার বাড়ী পদচিহ্নে জানিয়া একজন সিপাহী তাহাকে সাহেবের কাছে লইয়া গেল। সাহেবের কাছে গিয়া বৈষ্ণবী খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া গান ধরিল—

"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।"

সাহেব তাহাকে পদচিহ্ন সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু কোন প্রশ্নেরই সদুত্তর পাইলেন না।

শান্তি বলিল, "ভাল ক'রে বকশিশ দাও তো, না হয় পরশু এসে খবর ব'লে যাব।"

সাহেব তখন ঝনাৎ করিয়া একটা নগদ টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "পরশু নেহি বিবি! আজ রাৎকো হামকো খবর মিল্না চাহিয়ে।"

শান্তি। দূর বেটা! বৈষ্ণবী বল্, বিবি কি?—আজ দশ কোশ

রাস্তা যাব—আসব—ওঁকে খবর এনে দেব! ছুঁচো বেটা কোথাকার।

এড্। ছুঁচো ব্যাটা কেস্কা কয়তা হ্যায়?

শান্তি। যে বড় বীর—ভারী জাঁদরেল।

এড্। গ্রেট জেনারেল হাম হো শক্তা হ্যায়—ক্লাইবকা মাফিক। লেকেন আজ হামকো খবর মিল্‌নে চাহিয়ে। পানশো রূপেয়া বকশিশ দেঙ্গে।

সাহেবের হুকুমে খবর জানিবার জন্য লিণ্ড্‌লে নামক একজন যুবা এন্‌সাইন্ ঘোড়ায় চড়িয়া শান্তির সঙ্গে চলিল। শান্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া চলিল। এইরূপে তাহারা কিছু দূর আসিলে শান্তি বলিল, "ছি! রেকাব পায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া!"

বড়াই করিবার জন্য লিণ্ড্‌লে রেকাব হইতে পা তুলিল। শান্তি অমনি নির্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল। লিণ্ড্‌লে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিল। শান্তি বায়ুবেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল।

শান্তি বনমধ্যে যাইয়া জীবানন্দকে সকল সমাচার বলিল।

জীবানন্দ বলিলেন, "তবে আমি শীঘ্র গিয়া মহেন্দ্রকে সতর্ক করি। তুমি মেলায় গিয়া সত্যানন্দ প্রভুকে খবর দাও।"

১৯

এডওয়ার্ডস্ পাকা ইংরেজ। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাঁহার লোক ছিল। শীঘ্র তাঁহার নিকটে সকল খবর পৌঁছিল। শুনিয়াই তিনি তাম্বু তুলিবার হুকুম দিলেন।

এদিকে মহেন্দ্র সন্তানসেনা লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জীবানন্দও আসিয়া জুটিলেন।

শান্তি বায়ুবেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল ।

উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গাহিল—

"তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি,
তুমি মা বাহুতে শক্তি,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

কিন্তু ইংরেজের কামানের গুড়ুম্ গুড়ম্ গুম্ শব্দে সে মহাগীতি ভাসিয়া গেল। শত শত সন্তান হত-আহত হইল। বৃথাই জীবানন্দ, বৃথাই মহেন্দ্র যত্ন করিতে লাগিলেন। কে কোথায় পলায় ঠিকানা নাই।

তখন জীবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "কে হরিনাম করিতে করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস।"—এই বলিয়া তিনি লৌহবৃষ্টিমধ্যে বেগে অশ্বচালন করিলেন।

কতকগুলি সন্তান জীবানন্দের অমানুষী কীর্তি দেখিয়া বলিল, "জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না? চল, জীবানন্দের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে যাই।"

এই কথা শুনিয়া সমস্ত সন্তানসৈন্য মার্ মার্ শব্দে ফিরিয়া ইংরেজ-সৈন্যের উপর ধাবিত হইল।

এদিকে ইংরেজসেনার মধ্যে একটা ভারী হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া মহেন্দ্র সন্তানগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "সন্তান-গণ! ঐ দেখ, প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি রণে অবতীর্ণ। বল 'হরে মুরারে! হরে মুরারে!'—শত্রুর বুকে পিঠে চাপিয়া মার।"

তখন তুমুল যুদ্ধ হইল। দুই সন্তানসেনা-সংঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল। হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।

২০

পূর্ণিমার রাত্রি।—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির। জীবন্তে মৃতে, মনুষ্যে অশ্বে মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে তাহা অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল।

সেই নিশীথকালে শান্তি সেই রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। শবরাশির মধ্যে সে কি খুঁজিতেছিল। কিন্তু যা খুঁজে, তা কোথাও পাইল না। তখন শান্তি সেই শবরাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে অতি মধুর কণ্ঠে কে যেন তাহাকে বলিল, "উঠ মা, কাঁদিও না। জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি।"

শান্তি চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে এক জটাজূটধারী মহাপুরুষ।

রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে অসংখ্য শবরাশি নাড়িয়া সেই মহাবলবান পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল, সেই জীবানন্দের দেহ। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা, তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ। —তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব।"

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বন্যলতাপাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন। তার পর বারংবার জীবানন্দের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধে কার জয় হইল?"

শান্তি বলিল, "তোমারই জয় হইয়াছে। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।"

তখন উভয়ে দেখিল, কেহ কোথাও নাই। কাহাকে প্রণাম করিবে ? জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া আসিল।

শান্তি বলিল, "মার কার্যোদ্ধার হইয়াছে—চল, এখন আমরা দেশে দেশে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াই।"

জীবানন্দ। তার পর ?

শান্তি। তার পর—হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া দুইজনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মার মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।

তখন দুইজনে উঠিয়া হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে অন্তর্হিত হইল।

২১

সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমন সময়ে সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, তোমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য নাই। হিন্দুরাজ্য এখনও স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে ; অতএব চল।"

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্মপীড়ায় কাতর হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি মাতৃরূপা জন্মভূমির প্রতিমার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় মা! তোমায় উদ্ধার করিতে পারিলাম না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না!"

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের

কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।”

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, “শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।”

মহাপুরুষ বলিলেন, “চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্তি দেখাইব।”

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তির সম্মুখে ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্তি শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে; ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন।

বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

দুর্গেশনন্দিনী

১

মোগলসম্রাট্‌কুলতিলক আকবরের অভ্যুদয়ের পূর্বে বঙ্গদেশে স্বাধীন পাঠানরাজগণ রাজত্ব করিতেন। আকবরের সেনাপতি মনাইম খাঁ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পাঠান-নরপতি দাউদ খাঁ সগণে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন; বঙ্গরাজ্য মোগলভূপালের কর-কবলিত হইল। পাঠানেরা উৎকলে সংস্থাপিত হইলে, তথা হইতে তাহাদিগের উচ্ছেদ করা মোগলদিগের কষ্টসাধ্য হইল। কয়েক বৎসর পরে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি খাঁ জাহা খাঁ পাঠানদিগকে দ্বিতীয়বার পরাজিত করিয়া উৎকলদেশ নিজ প্রভুর দণ্ডাধীন করিলেন। ইহার পর আর এক দারুণ উপদ্রব উপস্থিত হইল। আকবর বঙ্গদেশের রাজকর আদায়ের যে নূতন প্রণালী প্রবর্তিত করিলেন, তাহাতে ভূম্যধিকারিগণের গুরুতর অসন্তুষ্টি জন্মিল। তাঁহারা নিজ নিজ পূর্বাধিপত্য রক্ষার্থ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। সময় পাইয়া উড়িষ্যার পাঠানেরা পুনর্বার মস্তক উন্নত করিল ও কতলু খাঁ নামক এক পাঠানকে আধিপত্যে বরণ করিয়া পুনরায় উড়িষ্যা স্বকরগ্রস্ত করিল। মেদিনীপুরও তাহাদের অধিকারভুক্ত হইল।

রাজপ্রতিনিধি খাঁ আজিম, তৎপরে শাহবাজ খাঁ কেহই শত্রুবিজিত দেশ পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না। পরিশেষে মহামতি আকবর রাজা মানসিংহকে বঙ্গ ও বেহারের শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন।

৯৯৬ সালে মানসিংহ পাটনায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে অপরাপর উপদ্রবের শান্তি করিলেন। তৎপর তিনি বর্ধমানে উপনীত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। তথায় অবস্থিতিকালে তিনি লোকমুখে সংবাদ পাইলেন যে, কতলু খাঁ মান্দারণের অনতিদূরে সসৈন্য আসিয়া দেশ লুঠ করিতেছেন। রাজা উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া শত্রুবল কোথায় কি অভিপ্রায়ে

আসিয়াছে, কি করিতেছে, ইহা নিশ্চয় জানিবার জন্য একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রেরণ করা উচিত বিবেচনা করিলেন। মানসিংহের সহিত তাঁহার প্রিয়তম পুত্র জগৎসিংহ যুদ্ধে আসিয়াছিলেন। জগৎসিংহ এই দুঃসাহসিক কার্যের ভার লইতে সোৎসুক জানিয়া, রাজা তাঁহাকেই এক শত অশ্বারোহী সেনা সঙ্গে দিয়া শত্রুশিবিরোদ্দেশে প্রেরণ করিলেন।

২

মান্দারণ এখন ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তখন ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। সেখানে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল। এই জন্যই তাহার নাম গড়-মান্দারণ। নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত। একস্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ এক খণ্ড ত্রিকোণ-ভূমির দুই দিক্ বেষ্টিত হইয়াছিল ; তৃতীয় দিকে এক গড় ছিল। এই ত্রিকোণ-ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। বীরেন্দ্র সিংহনামা একজন হিন্দু সৈনিক এখানে বসতি করিতেন।

যৌবনকালে বীরেন্দ্রসিংহ দাম্ভিক এবং অধীর ছিলেন, পিতার আদেশ কদাচিৎ প্রতিপালন করিতেন। এ জন্য পিতা রোষপরবশ হইয়া পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বীরেন্দ্র পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যোদ্ধৃবৃত্তি অবলম্বনের জন্য দিল্লী যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে উপনীত হইয়া তিনি মোগলসম্রাটের আজ্ঞাকারী রাজপুতসেনামধ্যে যোদ্ধৃত্বে বৃত হইলেন। অল্পকালে নিজগুণে উচ্চপদস্থ হইতে পারিলেন। কয়েক বৎসর পরে পিতার লোকান্তর-সংবাদ পাইয়া বীরেন্দ্রসিংহ বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার সহিত দিল্লী হইতে অনেকানেক সহচর আসিয়াছিল। তন্মধ্যে জনৈক পরিচারিকা আর এক পরমহংস ছিলেন। পরিচারিকার নাম বিমলা, পরমহংসের নাম অভিরাম স্বামী।

বিমলা গৃহমধ্যে গৃহকর্মে, বিশেষতঃ বীরেন্দ্রের মাতৃহীনা কন্যা তিলোত্তমার লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন। গৃহিণী যাদৃশী মান্যা, বিমলা পৌরগণের নিকটে প্রায় তাদৃশী মান্যা ছিলেন। তিলোত্তমাকে বিমলা আন্তরিক স্নেহ করিতেন। তিলোত্তমাও বিমলার তদ্রূপ অনুরাগিণী ছিলেন।

অভিরাম স্বামী সর্বদা দুর্গমধ্যে থাকিতেন না; মধ্যে মধ্যে দেশ-পর্যটনে গমন করিতেন। পুরবাসী ও অপরাপর লোকের এইরূপ প্রতীতি ছিল যে, অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রসিংহের দীক্ষাগুরু। বীরেন্দ্র-সিংহ তাঁহাকে যেরূপ সম্মান এবং আদর করিতেন, তাহাতে সেইরূপই সম্ভাবনা। এমন কি সাংসারিক যাবতীয় কার্য অভিরাম স্বামীর পরামর্শ ব্যতীত করিতেন না।

বিমলা ও অভিরাম স্বামী ভিন্ন আশমানী নাম্নী একজন দাসী বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে আসিয়াছিল।

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ নামে অভিরাম স্বামীর একজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহার শাস্ত্রে যত ব্যুৎপত্তি থাকুক বা না থাকুক, রসিকতা করার তৃষ্ণাটা বড় প্রবল ছিল। সেজন্য বিমলা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—"রসিকরাজ রসোপাধ্যায়।"

... ...

মোগল-পাঠানে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। মোগল-সেনাপতি মান-সিংহের প্রতি বীরেন্দ্রসিংহ বিশেষ অপ্রসন্ন ছিলেন—তথাপি অভিরাম স্বামীর উপদেশক্রমে তিনি মানসিংহের অনুগামী হইবেন স্থির করিলেন।

পরে পাঠান দূত আসিয়া বীরেন্দ্রকে কতলু খাঁর পত্র প্রদান করিল। পত্রের মর্ম এই যে, বীরেন্দ্রসিংহ এক সহস্র অশ্বারোহী সেনা আর পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠানশিবিরে প্রেরণ করুন; নচেৎ কতলু খাঁ বিংশতি সহস্র সেনা গড়-মান্দারণে প্রেরণ করিবেন।

বীরেন্দ্রসিংহ পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, "দূত, তোমার প্রভুকে কহিও, তিনিই সেনা প্রেরণ করুন।" দূত নতশির হইয়া প্রস্থান করিল।

৩

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর ও দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল এবং অল্পকালমধ্যে মহারবে প্রবল ঝটিকা-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অশ্বারোহী গন্তব্য-পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে, একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে এক দেবমন্দির দেখিতে পাইলেন। অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়া, নিজে অন্ধকারে সাবধানে মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। পথিক দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই দ্বারোন্মোচন করিতে আসিল না। কিন্তু কাষ্ঠের কপাট তাঁহার দারুণ করপ্রহার অধিকক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র তিনি যেমন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, অমনি মন্দিরমধ্যে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ও তন্মুহূর্তে মুক্তদ্বারপথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথায় যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল। ভক্তিভাবে মন্দিরমধ্যস্থ অদৃশ্য দেবমূর্তির উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, নির্ভীক যুবা ডাকিয়া কহিলেন, "মন্দিরমধ্যে কে আছ?" কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না; কিন্তু অলঙ্কার-ঝঙ্কারশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন দ্বার যোজিত করিলেন

এবং ভগ্নার্গলের পরিবর্তে আত্মশরীর দ্বারে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্বার কহিলেন, "যে কেহ মন্দিরমধ্যে থাক, শ্রবণ কর—এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে, যদি পুরুষ হও, তবে ফলভোগ করিবে; আর যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, রাজপুতহস্তে অসিচর্ম থাকিতে তোমাদের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।"

"আমরা বড় ভীত হইয়াছি। আপনি কে?" বামাস্বরে মন্দিরমধ্য হইতে এই প্রশ্ন হইল।

শুনিয়া সবিস্ময়ে পথিক উত্তর করিলেন, "আমি যেই হই, আমি উপস্থিত থাকিতে অবলাজাতির কোন প্রকার আশঙ্কা নাই।"

রমণী উত্তর করিল, "আপনার কথা শুনিয়া সাহস হইল। আমরা সায়াহ্নকালে এই শৈলেশ্বর শিবপূজার জন্য আসিয়াছিলাম। পরে ঝড় আসিলে, আমাদিগের বাহক দাসদাসীগণ আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারি না।"

যুবক কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব।"

রমণী কহিল, "শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

অর্ধরাত্রে ঝটিকা-বৃষ্টি নিবারিত হইলে, যুবক মন্দিরের বাহিরে আসিয়া, জ্যোৎস্নার আলোকে মন্দির-রক্ষকের গৃহে গমন করিয়া সেখান হইতে প্রদীপ জ্বালিয়া আনিলেন। দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে শ্বেত-প্রস্তর-নির্মিত শিবমূর্তির পশ্চাদ্ভাগে দুইজনমাত্র কামিনী। একজন নবীনা, বয়স ষোড়শ বৎসর—তিনি দীপ দেখিবামাত্র সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হইয়া বসিলেন। তাঁহার বিচিত্র কারুকার্যখচিত পরিচ্ছদ ও রত্নাভরণ-পারিপাট্য দেখিয়া পান্থ নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলেন যে, তিনি হীনবংশসম্ভূতা নহেন। দ্বিতীয়া রমণীর পরিচ্ছদের অপেক্ষাকৃত হীনার্ঘতায়

পথিক বিবেচনা করিলেন যে, ইনি নবীনার সহচারিণী হইবেন। বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ বোধ হইল। পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে। তাঁহার দেহে কবচাদি রাজপুত-জাতির পরিচ্ছদ শোভা করিতেছিল। কটিদেশে কটিবন্ধে কোষসংবদ্ধ অসি, দীর্ঘ করে দীর্ঘ বর্শা, মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি একখণ্ড হীরক, কর্ণে মুক্তাসহিত কুণ্ডল, কণ্ঠে রত্নহার।

উভয় পক্ষেই পরস্পরের পরিচয় জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু কেহই প্রথমে পরিচয় জিজ্ঞাসার অভদ্রতা স্বীকার করিতে সহসা ইচ্ছুক হইলেন না।...

নবীনা অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া সহচরীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে অনিমেষ-চক্ষুতে যুবকের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। কথোপকথনমধ্যে অকস্মাৎ পথিকেরও সেই দিকে দৃষ্টিপাত হইল; আর দৃষ্টি ফিরিল না। তাঁহার বোধ হইল, যেন তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি আর কখন দেখিতে পাইবেন না। যুবতীর চক্ষুর্দ্বয়ের সহিত পথিকের চক্ষু সম্মিলিত হইল। যুবতী অমনি লোচনযুগল বিনত করিলেন। সহচরী বাক্যের উত্তর না পাইয়া পথিকের মুখপানে চাহিলেন। কোন্ দিকে তাঁহার দৃষ্টি, তাহাও নিরীক্ষণ করিলেন এবং নবীনা যে যুবকের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিতে-ছিলেন, তাহা জানিতে পারিয়া, নবীনার কানে কানে বলিলেন, "কি লো, শিবসাক্ষাৎ স্বয়ংবরা হবি নাকি?"

নবীনা, সহচরীকে অঙ্গুলিনিপীড়িত করিয়া তদ্রূপ মৃদুস্বরে কহিলেন, "তুমি নিপাত যাও।"

সহচরী তখন নারীস্বভাবসিদ্ধ চতুরতার সহিত যুবককে কহিলেন, "মহাশয়, এখন ঝড় থামিয়াছে, দেখি, যদি আমরা পদব্রজে বাটী গমন করিতে পারি।"

যুবাপুরুষ উত্তর করিলেন, "যদি একান্ত এ নিশীথে আপনারা পদব্রজে যাইবেন, তবে আমি আপনাদিগকে রাখিয়া আসিতেছি।"

কামিনী উত্তর করিলেন, "আপনি আমাদিগকে রাখিয়া আসিলে আমাদিগের সৌভাগ্য, কিন্তু যখন আমার প্রভু—এই কন্যার পিতা—ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি এ রাত্রে কাহার সঙ্গে আসিয়াছ, তখন ইনি কি উত্তর করিবেন ?"

যুবক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "উত্তর করিবেন যে, আমি মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহের সঙ্গে আসিয়াছি।"

যদি তন্মুহূর্তে মন্দিরমধ্যে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও মন্দিরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা অধিকতর চমকিত হইয়া উঠিতেন না। উভয়েই অমনি গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কনিষ্ঠা শিবলিঙ্গের পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। বয়োধিকা গলদেশে অঞ্চল দিয়া দণ্ডবৎ হইলেন; অঞ্জলিবদ্ধকরে কহিলেন, "যুবরাজ, না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, নিজগুণে মার্জনা করিবেন।"

যুবরাজ হাসিয়া কহিলেন, "এ গুরুতর অপরাধের ক্ষমা নাই ; তবে ক্ষমা করি যদি পরিচয় দাও। পরিচয় না দিলে, অবশ্য সমুচিত দণ্ড দিব।"

রমণী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কি দণ্ড, আজ্ঞা হউক, স্বীকৃত আছি।"

জগৎসিংহও হাসিয়া কহিলেন, "সঙ্গে গিয়া তোমাদের বাটী রাখিয়া আসিব।"

সহচরী দেখিলেন, বিষম সঙ্কট। কোন বিশেষ কারণে তিনি নবীনার পরিচয় দিল্লীশ্বরের সেনাপতির নিকট দিতে সম্মত ছিলেন না ; তিনি যে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবেন, ইহাতে আরও ক্ষতি, সে তো পরিচয়ের অধিক। অতএব সহচরী অধোবদনে রহিলেন।

এমন সময়ে মন্দিরের অনতিদূরে কয়েকজন অস্ত্রধারী ব্যক্তির সহিত বাহকগণ শিবিকা লইয়া আসিতেছে দেখিয়া যুবরাজ সহচরীকে কহিলেন, "উহারা তোমাদিগের লোক কিনা দেখ।" সহচরী দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের রক্ষিগণ বটে।

রাজকুমার কহিলেন, "তবে আমি আর এখানে দাঁড়াইব না, আমার সহিত ইহাদের সাক্ষাতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা সপ্তাহমধ্যে প্রকাশ করিও না।"

সহচরী বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "যুবরাজ, আমি যে পরিচয় দিলাম না, ইহার অবশ্য উপযুক্ত কারণ আছে। যদি আপনি এ বিষয়ে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকেন, তবে অদ্য হইতে পক্ষান্তরে আপনার সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, বলিয়া দিন।"

জগৎসিংহ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "পক্ষান্তরে রাত্রিকালে এই মন্দিরমধ্যেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে।"

"দেবতা আপনাকে রক্ষা করুন" বলিয়া সহচরী পুনর্বার প্রণতা হইলেন।

রাজকুমার চলিয়া গেলেন।

নবীনা ও তাঁহার সহচারিণী—তিলোত্তমা ও বিমলা।

৪

বিমলা ও তিলোত্তমার শৈলেশ্বরমন্দিরে জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাতের পর এক পক্ষ অতীত হইল। পরদিন প্রদোষকালে বিমলা নিজ কক্ষে বসিয়া বেশভূষা করিতেছিলেন। আজ রাত্রে তাঁহার রাজপুত্রের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার কথা। বেশভূষা শেষ করিয়া বিমলা আশমানীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি আজ কোন প্রয়োজনে অধিক দূর যাইব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। তবে একটা কথা—মনে কর,

যদি তোমার সঙ্গে আজ সে-কালের কোন লোকের—কুমার জগৎসিংহের দেখা হয়, তবে কি তোমাকে তিনি চিনিতে পারিবেন ?"

আশমানী অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া গদ্‌গদস্বরে কহিল, "এমন দিন কি হবে ?"

বিমলা কহিলেন, "হইতেও পারে।"

আশমানী কহিল, "কুমার চিনিতে পারিবেন বৈ কি ?"

বিমলা কহিলেন, "তবে তোমার যাওয়া হইবে না, আর কাহাকে লইয়া যাই,—একাও তো যাইতে পারি না।"

বিমলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশমানী অকস্মাৎ মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। বিমলা কহিলেন, "মর্! আপনা-আপনি হেসে মরিস্ কেন ?"

আশমানী কহিল, "মনে মনে ভাবিতেছিলাম, বলি সোনার চাঁদ দিগ্‌গজকে তোমার সঙ্গে পাঠাইলে কি হয় ?"

বিমলা হাসিয়া উল্লাসে কহিলেন, "সেই কথাই ভাল, রসিকরাজকেই সঙ্গে লইব।"

আশমানী হাসিতে হাসিতে দিগ্‌গজকে আনিবার জন্য দুর্গমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র কুটীরাভিমুখে চলিল। সেই মহাপুরুষ এই কুটীরের অধিকারী। দিগ্‌গজ মহাশয় দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত হইবেন, প্রস্থে বড় জোর আধ হাত তিন আঙ্গুল। বর্ণ দোয়াতের কালি; বোধ হয়, অগ্নি কাষ্ঠ-ভ্রমে পা দুইখানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রস না পাইয়া অর্ধেক অঙ্গার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। দিগ্‌গজ মহাশয় অধিক দৈর্ঘ্যবশতঃ একটু কুঁজো; অবয়বের মধ্যে নাসিকা প্রবল, শরীরের মাংসাভাব সেইখানেই সংশোধন হইয়াছে। মাথার চুলগুলি ছোট ছোট করিয়া কামান, হাত দিলে স্থচ ফুটে। আর্কফলার ঘটাটা জাঁকালরকম।

গজপতি, বিদ্যাদিগ্‌গজ উপাধি সাধ করিয়া পান নাই। বুদ্ধিখানা অতি তীক্ষ্ণ। বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সাড়ে সাত মাসে 'সহর্ণের্ঘ' সূত্রটি ব্যাখ্যাশুদ্ধ মুখস্থ হয়। ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুগ্রহে আর দশজনের গোলে-হরিবোলে পঞ্চদশ বৎসর পাঠ করিয়া শব্দকাণ্ড শেষ করিলেন। পরে অন্য কাণ্ড আরম্ভ করিবার পূর্বে অধ্যাপক ভাবিলেন, "দেখি দেখি, কাণ্ডখানাই কি?" শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি বাপু, রাম শব্দের উত্তর অম্ করিলে কি হয়?" ছাত্র অনেক ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "রামকান্ত।" অধ্যাপক কহিলেন, "বাপু, তোমার বিদ্যা হইয়াছে; তুমি গৃহে যাও। তোমার এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে, আমার আর বিদ্যা নাই যে তোমাকে দান করিব।"

গজপতি সাহঙ্কারে কহিলেন, "আমার এক নিবেদন—আমার উপাধি?"

অধ্যাপক কহিলেন, "বাপু, তুমি যে বিদ্যা উপার্জন করিয়াছ, তোমার নূতন উপাধি আবশ্যক। তুমি 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' উপাধি গ্রহণ কর।"

দিগ্‌গজ হৃষ্টচিত্তে গুরুপদে প্রণাম করিয়া গৃহে চলিলেন।

গৃহে আসিয়া দিগ্‌গজ-পণ্ডিত মনে মনে ভাবিলেন, "ব্যাকরণাদিতে তো কৃতবিদ্য হইলাম। এখন কিঞ্চিৎ স্মৃতি পাঠ করা আবশ্যক। শুনিয়াছি, অভিরাম স্বামী বড় পণ্ডিত, তিনি ব্যতীত আমাকে শিক্ষা দেয়, এমন লোক আর নাই।" এই স্থির করিয়া দিগ্‌গজ দুর্গমধ্যে অধিষ্ঠান করিলেন। অভিরাম স্বামী অনেককে শিক্ষা দিতেন; কাহারও প্রতি বিরক্ত ছিলেন না। দিগ্‌গজ কিছু শিখুন বা না শিখুন, অভিরাম স্বামী তাঁহাকে পাঠ দিতেন। আশমানী তাঁহার দ্বারা বানর পোষার সাধ মিটাইয়া লইত। বিমলাও সন্ধান পাইয়া কখন কখন বানর নাচাইতে যাইতেন।

৫

আশমানী দিগ্‌গজের কুটীরে আসিয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ, ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ডাকিল, "ও ঠাকুর!"

কেহ উত্তর দিল না।

"বলি ও গোঁসাই!"

উত্তর নাই।

"মর্, বিটলে কি করিতেছে? ও রসিকরাজ রসোপাধ্যায় প্রভু!"

উত্তর নাই।

আশমানী দ্বারের ছিদ্র দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়াছে, এই জন্য কথা নাই। আশমানী ভাবিল, "ইহার আবার নিষ্ঠা! দেখি, কথা কহিয়া আবার খায় কিনা।"

"বলি ও রসিকরাজ!"

উত্তর নাই।

"ও রসরাজ!"

উত্তর—"হুম্।"

"বামুন ভাত গালে করিয়া উত্তর দিতেছে, ও কথা তো কথা হইল না"—এই ভাবিয়া আশমানী কহিল, "ও রসমাণিক!"

উত্তর—"হুম্!"

আ। বলি কথাই কও না, খেও এর পরে।

উত্তর—"হু-উ-উম্!"

আ। বটে, বামুন হইয়া এই কাজ—আজি স্বামী ঠাকুরকে ব'লে দেব। ঘরের ভিতর কে ও?

ব্রাহ্মণ শশঙ্কচিত্তে শূন্যঘরের চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কেহ নাই দেখিয়া পুনর্বার আহার করিতে লাগিলেন।

আশমানী বলিল, "ও যে জেতে চাঁড়াল। আমি যে চিনি।"

দিগ্‌গজের মুখ শুকাইল। বলিলেন, "কে চাঁড়াল? ছুঁয়া পড়ে নি তো?"

আশমানী আবার কহিল, "ও, আবার খাও যে? কথা কহিয়া আবার খাও?"

দি। কই, কখন কথা কহিলাম?

আশমানী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "এই যে কহিলে।"

দি। বটে, বটে, বটে, তবে আর খাওয়া হইল না।

আ। হাঁ তো; উঠে আমায় দ্বার খুলে দাও।

আশমানী ছিদ্র হইতে দেখিতেছিল, ব্রাহ্মণ যথার্থই অন্ন ত্যাগ করিয়া উঠেন—কহিল, "না, না, ও কয়টি ভাত খাইয়া উঠিও।"

দি। না, আর খাওয়া হইবে না, কথা কহিয়াছি।

আ। সে কি! না খাও তো আমার মাথা খাও।

দি। রাধে মাধব! কথা কহিলে কি আর আহার করিতে আছে?

আ। বটে, তবে আমি চলিলাম।

দি। না, না, আশমান! তুমি রাগ করিও না; আমি এই খাইতেছি।

ব্রাহ্মণ আবার খাইতে লাগিলেন। দুই-তিন গ্রাস আহার করিবামাত্র আশমানী কহিল, "উঠ, হইয়াছে, দ্বার খোল।"

দি। এই ক'টা ভাত খাই।

আ। এ যে পেট আর ভরে না; উঠ, নহিলে কথা কহিয়া ভাত খাইয়াছ, বলিয়া দিব।

দি। আঃ নাও, এই উঠিলাম।

ব্রাহ্মণ অতি ক্ষুণ্ণমনে অন্ন ত্যাগ করিয়া, গণ্ডূষ করিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

আশমানী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দিগ্‌গজ হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "ওঁ আয়াহি বরদে দেবি!"

আশমানী কহিল, "এটি যে সরস কবিতা, কোথা পাইলে?"

দি। তোমার জন্য এটি আজ রচনা করিয়া রাখিয়াছি।

আ। সাধ করিয়া তোমায় রসিকরাজ বলেছি?

দি। তুমি বইস; আমি হস্ত প্রক্ষালন করি।

আ। সে কি, হাত ধোও যে? ভাত খাও না?

দি। ভোজন করিয়া উঠিয়াছি, আবার ভাত খাব কিরূপে?

আ। কেন, তোমার ভাত রহিয়াছে যে? উপবাস করিবে?

দিগ্‌গজ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "কি করি, তুমি তাড়াতাড়ি করিলে!" এই বলিয়া সতৃষ্ণনয়নে অন্নপানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

আশমানী কহিল, "তবে আবার খাইতে হইবে।"

দি। রাধে মাধব! গণ্ডূষ করিয়াছি, গাত্রোত্থান করিয়াছি, আবার খাইব?

আ। হাঁ, খাইবে বই কি। আমারই উচ্ছিষ্ট খাইবে।

এই বলিয়া আশমানী এক গ্রাস অন্ন লইয়া আপনি খাইল।

ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

আশমানী উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজনপাত্রে রাখিয়া কহিল, "খাও।"

ব্রাহ্মণের বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই।

আ। খাও, শোন, কাহাকেও বলিব না যে, তুমি আমার উচ্ছিষ্ট খাইয়াছ। কেহ না জানিতে পারিলে দোষ কি?

দি। তাও কি হয়?

কিন্তু দিগ্‌গজের উদরমধ্যে অগ্নিদেব প্রচণ্ড জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন।

আশমানী ভাব বুঝিয়া বলিল, "খাও—না খাও, একবার পাতের কাছে বসো।"

দি। শুধু পাতের কাছে বসিতে কোন দোষ নাই। তোমার কথা রাখিলাম।

এই বলিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত পাতের কাছে গিয়া বসিলেন উদরে ক্ষুধা, কোলে অন্ন, অথচ খাইতে পারিতেছেন না—দিগ্‌গজের চক্ষে জল আসিল।

আ। শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণে ছুঁলে কি হয়?

দি। নাইতে হয়।

আ। তুমি আমার কথায় এই রাত্রে নাইতে পার?

দিগ্‌গজ আকর্ণ হাসিয়া বলিলেন, "তার কথা কি? এখনই নাইতে পারি।"

আ। আমার ইচ্ছা হইয়াছে, তোমার পাতে প্রসাদ পাইব। তুমি আমাকে দু'টি ভাত মাখিয়া দাও।

দিগ্‌গজ উচ্ছিষ্টাবশেষ একত্রিত করিয়া মাখিতে লাগিলেন।

আ। একটি উপকথা বলি, শুন। যতক্ষণ উপকথা বলিব, ততক্ষণ তুমি ভাত মাখিবে, নইলে আমি খাইব না।

দি। আচ্ছা।

আশমানী এক রাজা আর তাহার দুয়ো শুয়ো দুই রাণীর গল্প আরম্ভ করিল। দিগ্‌গজ হাঁ করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া শুনিতে লাগিলেন —আর ভাত মাখিতে লাগিলেন।

শুনিতে শুনিতে দিগ্‌গজের মন আশমানীর গল্পে ডুবিয়া গেল—ভাতমাখা বন্ধ হইল—পাতে হাত লাগিয়া রহিল। কিন্তু যখন আশমানীর গল্প বড় জমিয়া আসিল, দিগ্‌গজের মন তাহাতে বড়ই নিবিষ্ট হইল, তখন দিগ্‌গজের হাত বিশ্বাসঘাতকতা করিল—মাখা-ভাতের গ্রাস তুলিয়া চুপি চুপি মুখে লইয়া গেল। মুখ হাঁ করিয়া তাহা গ্রহণ করিল। দন্ত বিনা আপত্তিতে তাহা চর্বণ করিতে আরম্ভ করিল। রসনা তাহা

গলাধঃকরণ করাইল। নিরীহ দিগ্‌গজের কোন সাড়া ছিল না। দেখিয়া আশমানী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তবে রে বিট্‌লে, আমার এঁটো নাকি খাবি নে ?"

তখন দিগ্‌গজের চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি আর এক গ্রাস মুখে দিয়া গিলিতে গিলিতে এঁটো হাতে আশমানীর পায়ে জড়াইয়া পড়িলেন। চর্বণ করিতে করিতে কাঁদিয়া বলিলেন, "আমায় রাখ; আশমান, কাহাকেও বলিও না।"

এমন সময় বিমলা আসিয়া বাহির হইতে দ্বার নাড়িলেন। বিমলা দ্বারপার্শ্ব হইতে অলক্ষ্যে সকল দেখিতেছিলেন। দ্বারের শব্দ শুনিয়া দিগ্‌গজের মুখ শুকাইল। আশ্‌মানী বলিল, "কি সর্বনাশ! বিমলা আসিয়াছে—লুকোও, লুকোও।"

দিগ্‌গজ-ঠাকুর কাঁদিয়া কহিলেন, "কোথায় লুকাইব ?"

আশমানী বলিল, "ঐ অন্ধকার কোণে একটা কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়া বসো গিয়া—অন্ধকারে ঠাওর পাইবে না।" দিগ্‌গজ তাহাই করিতে গেলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণ একটা অড়হর ডালের হাঁড়ি পাড়িয়া মাথায় দিলেন—তাহাতে আধ হাঁড়ি রাঁধা অড়হর ডাল ছিল—দিগ্‌গজ যেমন হাঁড়ি উল্টাইয়া মাথায় দিবেন, অমনি মস্তক হইতে অড়হর ডালের শতধারা বহিল—টিকি দিয়া অড়হর ডালের স্রোত নামিল। এই সময়ে বিমলা গৃহে প্রবেশ করিয়া দিগ্‌গজের শোভারাশি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দিগ্‌গজ বিমলাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। দেখিয়া বিমলার দয়া হইল। বিমলা বলিলেন, "কাঁদিও না। তুমি যদি এই অবশিষ্ট ভাতগুলি খাও, তবে আমরা কাহারও সাক্ষাতে এ-সকল কথা বলিব না।"

ব্রাহ্মণ তখন প্রফুল্ল হইলেন; পুনশ্চ আহারে বসিলেন—ইচ্ছা, অঙ্গের ডালটুকু মুছিয়া লন; কিন্তু তাহা পারিলেন না কিংবা সাহস করিলেন

না। সেজন্য অনেক পরিতাপ করিলেন। আহার সমাপনান্তে আশমানী তাঁহাকে স্নান করাইল। পরে ব্রাহ্মণ স্থির হইলে, বিমলা কহিলেন, "রসিক, যা বলি, তা পারিবে ?"

দি। পারিব না ?

বি। এখনই ?

দি। এখনই।

আশমানী। চল, আমরা এখান হইতে পলাইয়া যাই।

ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া রহিলেন। বিমলা কষ্টে উচ্চ হাসি সংবরণ করিলেন। আশমানী কহিল, "তবে কি পারিবে না ?"

দি। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ, তা তা—স্বামীঠাকুরকে বলিয়া আসি।

বিমলা। স্বামীঠাকুরকে আবার বল্‌বে কি ? এ কি তোমার মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত যে, স্বামীঠাকুরের কাছে ব্যবস্থা নিতে যাবে ?

দি। চল যাইতেছি।

বিমলা বলিলেন, "নামাবলী লও।"

দিগ্‌গজ নামাবলী গায়ে দিয়া বলিলেন, "তৈজসপত্র রহিল যে ?"

বি। ও সব তোমায় কিনে দিব।

ব্রাহ্মণ কিছু ক্ষুণ্ন হইলেন ; বলিলেন, "খুঙ্গীপুথি ?"

বিমলা বলিলেন, "শীঘ্র লও।"

বিদ্যাদিগ্‌গজের সবে দু'খানি পুথি,—ব্যাকরণ আর একখানি স্মৃতি। ব্যাকরণখানি হস্তে লইয়া বলিলেন, "এখানিতে কাজই বা কি, এ তো আমার কণ্ঠে আছে।" এই বলিয়া কেবল স্মৃতিখানি খুঙ্গীর মধ্যে লইলেন এবং 'দুর্গা শ্রীহরি' বলিয়া বিমলা ও আশমানীর সহিত যাত্রা করিলেন।

আশমানী বলিল, "তোমরা আগু হও, আমি পশ্চাতে যাইতেছি।" এই বলিয়া সে গৃহে গেল।

দুর্গদ্বারের বাহিরে কিয়দ্দূর আসিয়া দিগ্‌গজ কহিলেন, "কই, আশমানী আসিল না ?"

বিমলা কহিলেন, "সে বুঝি আসিতে পারিল না।"

রসিকরাজ নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তৈজসপত্র !"

৬

বিমলা দ্রুতপদবিক্ষেপে শীঘ্র মান্দারণ পশ্চাৎ করিলেন। নিশা অত্যন্ত অন্ধকার, নক্ষত্রালোকে সাবধানে চলিতে লাগিলেন। প্রান্তরপথে প্রবেশ করিয়া বিমলা কিঞ্চিৎ শঙ্কান্বিতা হইলেন; দিগ্‌গজ নিঃশব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, বাক্যব্যয়ও নাই। বিমলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রসিকরতন, কি ভাবিতেছ ?"

রসিকরতন বলিলেন, "বলি, তৈজসপত্রগুলা !"

বিমলা উত্তর না দিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে বিমলা আবার কথা কহিলেন, "দিগ্‌গজ, তুমি ভূতের ভয় কর ?"

"রাম ! রাম ! রাম ! রাম নাম বল'' বলিয়া দিগ্‌গজ বিমলার পশ্চাতে দুই হাত সরিয়া আসিলেন।

বিমলা কহিলেন, "এ পথে ভূতের বড় দৌরাত্ম্য।" দিগ্‌গজ আসিয়া বিমলার অঞ্চল ধরিলেন। বিমলা বলিতে লাগিলেন, "আমরা সেদিন শৈলেশ্বরের পূজা দিতে আসিতেছিলাম, পথের মধ্যে বটতলায় দেখি, এক বিকটাকার মূর্তি।"

ব্রাহ্মণ থরহরি কাঁপিতে আরম্ভ করিলেন। বিমলা বুঝিলেন, আর অধিক বাড়াবাড়ি করিলে ব্রাহ্মণের গতিশক্তি রহিত হইবে। অতএব ক্ষান্ত হইয়া কহিলেন, "রসিকরাজ, তুমি গাইতে জান ?"

দিগ্‌গজ বলিলেন, "জানি বই কি।"

বিমলা বলিলেন, "একটি গীত গাও দেখি।"

দিগ্‌গজ আরম্ভ করিলেন,—"এ হুম্—উ, হুম্—সই কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যামে কদম্বেরি ডালে।"

পথের ধারে একটা গাভী শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছিল, অলৌকিক শব্দ শুনিয়া বেগে পলায়ন করিল।—দিগ্‌গজের আর গান হইল না।

কিছুক্ষণ পরে বিমলা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অঞ্চলে বিষম টান পড়িয়াছে; পশ্চাৎ ফিরিয়া কহিলেন, "কি হইয়াছে? আবার ভূত নাকি?"

ব্রাহ্মণের বাক্য সরে না, কেবল অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন, "ঐ।"

বিমলা নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটি সুসজ্জিত অশ্ব মৃত্যুযন্ত্রণায় পড়িয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

বিমলা নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে মুমূর্ষু অশ্ব দেখিয়া তিনি চিন্তামগ্না হইলেন। অনেকক্ষণ পরে গজপতি আবার তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিলেন। বিমলা বলিলেন, "কি?" গজপতি একটি দ্রব্য লইয়া দেখাইলেন। বিমলা দেখিয়া বলিলেন, "এ সিপাহীর পাগড়ি।" বিমলা পুনর্বার চিন্তামগ্না হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। পথে গড়-মান্দারণের দিকে অনেক ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন দেখিয়া বিমলা বুঝিলেন, বহুতর সেনা সেখানে গিয়াছে। তিনি অধিকতর অন্যমনা হইলেন।

অচিরাৎ শৈলেশ্বরের মন্দিরের ধবল-শ্রী নিকটে দেখিতে পাইলেন। বিমলা ভাবিলেন যে, রাজপুত্রের সহিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই। অতএব কি প্রকারে তাহাকে বিদায় দিবেন, চিন্তা করিতে-

ছিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ পুনর্বার নিকটে আসিয়া বিমলার অঞ্চল ধরিলেন। বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি?"

ব্রাহ্মণ অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "সে কত দূর?"

বি। কি কত দূর?

দি। সেই বটগাছ।

বি। কোন্ বটগাছ?

দি। যেখানে তোমরা সেদিন দেখিয়াছিলে।

বি। কি দেখিয়াছিলাম?

দি। রাত্রিকালে নাম করিতে নাই।

বিমলা বুঝিতে পারিয়া সুযোগ পাইলেন। গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ইঃ!"

ব্রাহ্মণ অধিকতর ভীত হইয়া কহিলেন, "কি গা?"

বিমলা অস্ফুটস্বরে শৈলেশ্বরের মন্দিরের নিকটস্থ বটবৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, "সে ঐ বটতলা।"

দিগ্‌গজ আর নড়িলেন না। কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "আমি আর যাইতে পারিব না।"

বিমলা কহিলেন, "আমারও ভয় হইতেছে।"

ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া পলায়নোদ্যত হইলেন।

বিমলা দেখিলেন, বৃক্ষমূলে ধবলাকার একটা কি পদার্থ রহিয়াছে। তিনি জানিতেন যে, বৃক্ষমূলে শৈলেশ্বরের ষাঁড় শুইয়া থাকে; কিন্তু গজপতিকে কহিলেন, "গজপতি, ইষ্টদেবের নাম জপ, বৃক্ষমূলে কি দেখিতেছ?"

"ওগো—বাবা গো" বলিয়াই দিগ্‌গজ একেবারে চম্পট।

বিমলা তখন নিশ্চিন্ত হইয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

মন্দিরের কপাট বন্ধ। বিমলা সবলে কপাটে করাঘাত করিলেন।

ভিতর হইতে গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন হইল, "কে ?" বিমলা সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, "পথশ্রান্ত স্ত্রীলোক।"

কপাট মুক্ত হইল। বিমলা দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে, সম্মুখে কৃপাণহস্তে কুমার জগৎসিংহ।

বিমলা নতভাবে শৈলেশ্বরকে প্রণাম করিয়া যুবরাজকে প্রণাম করিলেন।

যুবরাজ কহিলেন, "তোমাদিগের মঙ্গল তো ?"

বি। যাহাতে মঙ্গল হয়, সেই প্রার্থনাতেই শৈলেশ্বরের পূজা করিতে আসিয়াছি।

যুব। তোমার প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়াছ কি ?

বি। কি প্রতিশ্রুতি ?

যুব। তোমার সখীর পরিচয়।

বি। পরিচয় দিতে সঙ্কোচ হয়। পরিচয় পাইয়া আপনি যদি অসুখী হন ?

যুব। যাহাই হউক, তুমি আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

বি। তিলোত্তমা বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।

জগৎসিংহের বোধ হইল যেন, তাঁহাকে কালসর্প দংশন করিল। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমারই কথা সত্য হইল। তিলোত্তমা আমার হইবে না।"

বি। যুবরাজ, একেবারেই বা কেন নিরাশ হন ? আজ বিধি বৈরী, কাল বিধি সদয় হইতে পারেন।

রাজপুত্র আশার কথা শুনিলেন। কহিলেন, "আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে ; যাহা অদৃষ্টে থাকে ঘটিবে, আমি কেবল একবারমাত্র তোমার সখীর দর্শনের ভিখারী।"

বিমলা হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "তবে চলুন।"

উভয়ে মন্দির হইতে নির্গত হইতে যান, এমন সময়ে মন্দিরের বাহিরে সাবধান-ন্যস্ত মনুষ্য-পদবিক্ষেপের শব্দ হইল। রাজপুত্র বাহিরে আসিয়া চতুর্দিক দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই।

উভয়ে শৈলেশ্বরকে প্রণাম করিয়া সশঙ্কচিত্তে গড়-মান্দারণ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদূর যাইবার পর পশ্চাতে মনুষ্যের পদধ্বনি স্পষ্ট শ্রুত হইল। রাজপুত্র অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও মনুষ্য দেখিতে পাইলেন না। বিমলাকে কহিলেন, "আমার সন্দেহ হইতেছে, কেহ আমাদের পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে। সাবধানে কথা কহা ভাল।"

উভয়ে অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে কহিতে চলিলেন। ক্রমে গড়-মান্দারণ গ্রামে উপস্থিত হইয়া দুর্গপার্শ্বস্থ আম্রকাননে প্রবেশ করিলেন। আম্রকাননে প্রবেশাবধি উভয়ে মনুষ্য-পদধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলেন। রাজপুত্র বিমলাকে কহিলেন, "তুমি ক্ষণেক দাঁড়াও, আমি দেখিয়া আসি।" তিনি অসি নিষ্কোষিত করিয়া যে দিকে শব্দ হইতেছিল, সেইদিকে গেলেন; কিন্তু কিছু দেখিতে পাইলেন না। সন্দেহ নিঃশেষ করা উচিত বিবেচনা করিয়া, তিনি অসিহস্তে আম্রবৃক্ষের উপর উঠিলেন। বহুক্ষণ ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, এক বৃহৎ আম্রবৃক্ষের শাখাসমষ্টিমধ্যে দুইজন মনুষ্য বসিয়া আছে; কেবল তাহাদিগের উষ্ণীষ দেখা যাইতেছে। রাজপুত্র নিঃশব্দে বিমলার নিকটে আসিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহা বিমলার নিকট বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "এ সময়ে দুইটা বর্শা থাকিলে ইহারা কে জানিতে পারিতাম। উষ্ণীষ দেখিয়া মনে হইতেছে, দুরাত্মা পাঠানেরা আমাদের সঙ্গ লইয়াছে।"

তৎক্ষণাৎ বিমলার পথপার্শ্বস্থ মৃত অশ্ব, উষ্ণীষ আর অশ্বসৈন্যের পদচিহ্ন স্মরণ হইল। তিনি কহিলেন, "আপনি তবে এখানে অপেক্ষা করুন; আমি বর্শা আনিতেছি।"

এই বলিয়া বিমলা ঝটিতি দুর্গমূলে গেলেন। যে কক্ষে বসিয়া সায়ংকালে বেশবিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহার নীচের কক্ষের একটি গবাক্ষ আম্রকাননের দিকে ছিল। সেই গবাক্ষে একটি গুপ্ত গা-চাবির কল ছিল। বিমলা অঞ্চল হইতে চাবি লইয়া ঐ কলে ফিরাইলেন; পরে জানালার গরাদে ধরিয়া দেয়ালের দিকে টান দিতেই জানালাটি দেয়ালের মধ্যে এক রন্ধ্রে প্রবেশ করিল। তখন বিমলা সেই গুপ্তপথে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অতি দ্রুত দুইটি বর্শা সহিত নির্গত হইয়া জগৎসিংহের নিকট গেলেন। ব্যস্ততাপ্রযুক্তই হউক বা নিকটেই থাকিবেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিবেন, এই জন্যই হউক, বিমলা বহির্গমনকালে গবাক্ষপথ অবরুদ্ধ করিলেন না। ইহাতে প্রমাদ ঘটিল। জানালার অতি নিকটে এক আম্রবৃক্ষ ছিল; তাহার অন্তরাল হইতে এক শস্ত্রধারী পুরুষ বিমলার এই ভ্রম দেখিতে পাইল। বিমলা দৃষ্টির অগোচর হইলেই সে ব্যক্তি গবাক্ষ-সন্নিধানে আসিয়া নিঃশব্দে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

এ দিকে রাজপুত্র বর্শা পাইয়া পূর্ব্ববৎ বৃক্ষারোহণ করিয়া দেখিলেন যে, এক্ষণে একটিমাত্র উষ্ণীষ দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তথায় নাই। রাজপুত্র বৃক্ষস্থ উষ্ণীষ লক্ষ্য করিয়া একটি বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। উষ্ণীষধারী বৃক্ষশাখাচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল।

জগৎসিংহ দ্রুত বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন যে, একজন সৈনিকবেশধারী সশস্ত্র মুসলমান মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে—বর্শা তাহার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়াছে। মৃতব্যক্তির কবচমধ্যে একখানা পত্র ছিল। জগৎসিংহ ঐ পত্র লইয়া জ্যোৎস্নায় আসিয়া পাঠ করিলেন—

"কতলু খাঁর আজ্ঞানুবর্তিগণ এই লিপি দৃষ্টিমাত্র লিপিবাহকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।

কতলু খাঁ।'

রাজপুত্র বিমলার নিকটে আসিয়া সবিশেষ বলিলেন। বিমলা শুনিয়া কহিলেন, "রাজকুমার, আর বিলম্বে অনিষ্ট আছে। দুর্গে চলুন, আমি দ্বার খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

উভয়ে দ্রুতগতি দুর্গমূলে আসিয়া, প্রথমে বিমলা পশ্চাৎ রাজপুত্র প্রবেশ করিলেন। বিমলা গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া, রাজপুত্রকে নিজ শয়নাগারে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আমি আসিতেছি, আপনাকে ক্ষণেক এই পালঙ্কের উপর বসিতে হইবে।"

বিমলা প্রস্থান করিয়া ক্ষণপরেই নিকটস্থ কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন।

"যুবরাজ, এই দিকে আসিয়া একটা নিবেদন শুনুন।"—যুবরাজ পালঙ্ক হইতে উঠিয়া কক্ষান্তরে বিমলার নিকটে গেলেন।

বিমলা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের ন্যায় তথা হইতে সরিয়া গেলেন; যুবরাজ দেখিলেন, সুবাসিত কক্ষ, রজত প্রদীপ জ্বলিতেছে, কক্ষ-প্রান্তে অবগুণ্ঠনবতী তিলোত্তমা।

বিমলা নিজ কক্ষে আসিয়া জগৎসিংহের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে আম্রকাননমধ্যে গম্ভীর তূর্যনিনাদ হইল। বিমলা চমকিয়া উঠিলেন। তিনি সশঙ্কচিত্তে বাতায়নে গিয়া আম্রকাননের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া ছাদে উঠিলেন; ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে করিতে আলিসার নিকটে গেলেন। মুখ নত করিয়া দুর্গমূল পর্যন্ত দেখিতে লাগিলেন; কিছুই দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে যেন কেহ পশ্চাৎ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিল। বিমলা

চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, একজন সুসজ্জিত সশস্ত্র অজ্ঞাত পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিমলা নিস্পন্দ ও বিহ্বল হইলেন।

সৈনিক পুরুষ কহিলেন, "চীৎকার করিও না। চীৎকার করিলে তোমার বিপদ ঘটিবে।"

বিমলা কহিলেন, "কে তুমি? তুমি কি প্রকারে দুর্গমধ্যে আসিলে?"

সৈনিক। আমি ওসমান খাঁ, কতলু খাঁর সেনাপতি। তুমি যখন জানালা খুলিয়া রাখিয়াছিলে, তখন প্রবেশ করিয়াছিলাম; তোমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ এ ছাদে আসিয়াছি। তোমার ওড়নার অঞ্চলে যে জানালার চাবি আছে, তাহা আমাকে দান করিয়া বাধিত কর।

চতুরা বিমলা কহিলেন, "মহাশয়, আমি ইচ্ছাক্রমে চাবি না দিলে, আপনি কি প্রকারে লইবেন?"

এই বলিতে বলিতে বিমলা অঙ্গ হইতে ওড়না খুলিয়া হস্তে লইলেন এবং তাহা আম্রকাননে নিক্ষেপ করিলেন। ওসমানেরও চক্ষু ওড়নার প্রতি ছিল। যেই বিমলা ওড়না নিক্ষেপ করিয়াছেন, ওসমান অমনি সঙ্গে সঙ্গে হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহা ধরিলেন।

ওসমান খাঁ ওড়না হস্তগত করিয়া এক হস্তে বিমলার হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিলেন, দন্তদ্বারা ওড়না ধরিয়া দ্বিতীয় হস্তে চাবি খুলিয়া নিজ কটিবন্ধে রাখিলেন। পরে বিমলাকে সেলাম করিয়া জোড়হাতে বলিলেন, "মাফ করিবেন।" এই বলিয়া ওড়নার দ্বারা বিমলার দুই হস্ত আলিসার সহিত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ওসমান চলিয়া গেলেন। বিমলা চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ শুনিতে পাইল না।

ওসমান নীচে আসিয়া দেয়ালের পথ মুক্ত করিয়া মৃদু মৃদু শিস দিতে লাগিলেন। বৃক্ষান্তরাল হইতে ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক পাঠানসেনা নিঃশব্দে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল।...

এ দিকে কিছুকালমধ্যে কৌশলে মুক্তিলাভ করিয়া বিমলা ঊর্ধ্বশ্বাসে বীরেন্দ্রের শয়নকক্ষাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ক্রমে অতিশয় কোলাহল শ্রবণ করিতে পাইলেন; বুঝিলেন, দুর্গবাসীরা জাগরিত হইয়াছে। ব্যস্ত হইয়া বীরেন্দ্রসিংহের শয়নকক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন যে, পাঠানসেনা দ্বার ভগ্ন করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—বীরেন্দ্রের হস্তে নিষ্কোষিত অসি, অঙ্গে রুধিরধারা। তিনি উন্মত্তের ন্যায় অসি ঘূর্ণিত করিতেছেন। কিন্তু একজন মহাবল পাঠানের দীর্ঘ তরবারির আঘাতে বীরেন্দ্রের অসি হস্তচ্যুত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল; তিনি বন্দী হইলেন।

বিমলা দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইয়া তিলোত্তমার কাছে দৌড়িয়া গেলেন। সেখানে এ পর্যন্ত পাঠানসেনা আইসে নাই। বিমলাকে দেখিয়া জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের কোলাহল ?"

বিমলা কহিলেন, "পাঠানের জয়ধ্বনি। শীঘ্র উপায় করুন।"

জগৎসিংহ। বীরেন্দ্রসিংহ কি করিতেছেন ?

বিমলা। তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন।

তিলোত্তমা অস্ফুট চীৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

জগৎসিংহ বিমলাকে কহিলেন, "দেখ দেখ, তিলোত্তমাকে দেখ।—আমি একা কি করিতে পারি ? তবে তোমাদের রক্ষার্থ প্রাণত্যাগ করিব।"

শীঘ্রই কক্ষ পাঠানসেনায় পরিপূর্ণ হইল। রাজকুমার বিদ্যুদ্বেগে অসিচালনা করিতে লাগিলেন। প্রতি আঘাতে হয় কোন পাঠান ধরাশায়ী, নচেৎ কাহারও অঙ্গচ্ছেদ হইতে লাগিল। রাজপুত্রের অঙ্গে চতুর্দিক হইতে বৃষ্টিধারাবৎ অস্ত্রাঘাত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্বাঙ্গ রুধিরে প্লাবিত হইল। ক্রমে তাঁহার বাহু ক্ষীণ হইয়া আসিল; মস্তক

ঘুরিতে লাগিল; চক্ষে ধূমাকার দেখিতে লাগিলেন; কর্ণে অস্পষ্ট কোলাহলমাত্র প্রবেশ করিতে লাগিল।

এই সময়ে ওসমান খাঁ বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "রাজপুত্রকে কেহ প্রাণে বধ করিও না, জীবিতাবস্থায় ব্যাঘ্রকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে হইবে।" এই কথার পর আর কোন কথা রাজপুত্র শুনিতে পাইলেন না।

৮

জগৎসিংহ যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তিনি সুরম্য হর্ম্যমধ্যে পর্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন। পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না; সর্বাঙ্গে দারুণ বেদনা। পালঙ্কের উপরে, রাজপুত্রের পার্শ্বে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক তাঁহার অঙ্গের ক্ষত-সকলে সাবধানে কি ঔষধ লেপন করিতেছিলেন। তিনি রাজপুত্রের উদ্যম দেখিয়া অতি মৃদু মধুরস্বরে কহিলেন, "স্থির থাকুন, চঞ্চল হইবেন না।"

রাজপুত্র ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমি কোথায়?"

সেই মধুরস্বরে উত্তর হইল, "কথা কহিবেন না, আপনি উত্তম স্থানে আছেন।"

রাজপুত্র। বেলা কত?

রমণী। অপরাহ্ণ। আপনি স্থির হউন, কথা কহিলে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন না।

রাজপুত্র কষ্টে কহিলেন, "আর একটি কথা, তুমি কে?"

রমণী কহিলেন, "আয়েষা।"

আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। আয়েষা দেখিতে পরমাসুন্দরী। রাজপুত্র আয়েষার প্রতি অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তিলোত্তমাকে মনে পড়িল। স্মৃতিমাত্র হৃদয় যেন

বিদীর্ণ হইয়া গেল, গভীর ক্ষত হইতে পুনর্বার রক্তপ্রবাহ ছুটিল ; রাজপুত্র পুনর্বার বিচেতন হইলেন।

হর্ম্যতলে গালিচার উপরে উত্তম পরিচ্ছদবিশিষ্ট একজন পাঠান বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ এবং মধ্যে মধ্যে পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া সপ্রেম দৃষ্টিতে আয়েষাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। আয়েষা তাঁহাকে কহিলেন, "ওসমান, শীঘ্র হাকিমের নিকট লোক পাঠাও।"

দুর্গজেতা ওসমান খাঁ আয়েষার কথা শুনিয়া উঠিয়া গেলেন এবং অচিরাৎ হাকিম লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। হাকিম অনেক যত্নে রক্তস্রাব নিবারণ করিলেন।

আয়েষা কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন অবস্থা দেখিতেছেন?"

"জ্বর অতি ভয়ঙ্কর। পুনর্বার যাতনা হইলে আমাকে ডাকিবেন।"
—বলিয়া হাকিম প্রস্থান করিলেন।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত আয়েষা জগৎসিংহের নিকট বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যখন দ্বিতীয় প্রহর তখন একজন পরিচারিকা আসিয়া আয়েষাকে কহিল যে, বেগম তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন।

"যাইতেছি" বলিয়া আয়েষা গাত্রোত্থান করিলেন। ওসমানও গাত্রোত্থান করিলেন। কহিলেন, "চল, তোমাকে রাখিয়া আসি।"

আয়েষা দাসদাসীদিগকে সতর্ক থাকিতে আদেশ করিয়া মাতৃগৃহ-অভিমুখে চলিলেন। পথে ওসমান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আজ বেগমের নিকট থাকিবে?"

আয়েষা কহিলেন, "না, আমি আবার রাজপুত্রের নিকট প্রত্যাগমন করিব।"

ওসমান কহিলেন, "আয়েষা, তোমার গুণের সীমা দিতে পারি

না; তুমি এই পরম শত্রুকে যেমন করিয়া শুশ্রূষা করিতেছ, ভগিনী ভ্রাতার জন্য এমন করে না। তুমি উহার প্রাণদান করিতেছ।"

আয়েষা একটু হাসিয়া কহিলেন, "ওসমান, আমি তো স্বভাবতঃ রমণী; পীড়িতের সেবা আমার পরম ধর্ম; না করিলে দোষ, করিলে প্রশংসা নাই; কিন্তু তোমার কি? যে তোমার পরম বৈরী, তুমি যে অনুদিন নিজে ব্যস্ত থাকিয়া তাহার সেবা করাইতেছ, তাহার আরোগ্য-সাধন করাইতেছ, ইহাতে তুমিই যথার্থ প্রশংসাভাজন।"

ওসমান কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের ন্যায় হইয়া কহিলেন, "তুমি আয়েষা, আপনার সুন্দর স্বভাবের মত সকলকে দেখ। আমার অভিপ্রায় তত ভাল নহে। তুমি দেখিতেছ না, জগৎসিংহ প্রাণ পাইলে আমাদিগের কত লাভ? যদি জগৎসিংহ জীবিত থাকিয়া আমাদিগের হস্তে কারারুদ্ধ থাকে, তবে মানসিংহকে হাতে পাইলাম; সে প্রিয়পুত্রের মুক্তির জন্য অবশ্য আমাদিগের মঙ্গলজনক সন্ধি করিবে। আর যদি জগৎসিংহকে আমাদিগের সদ্ব্যবহার দ্বারা বাধ্য করিতে পারি, তবে সেও আমাদিগের মনোমত সন্ধিবন্ধন পক্ষে যত্ন করিতে পারে; তাহার যত্ন নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। যদি নিতান্ত কিছু ফল না দর্শে, তবে জগৎসিংহের স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ মানসিংহের নিকট বিস্তর ধনও পাইতে পারিব। সুতরাং জগৎসিংহের জীবনে আমাদিগের উপকার।"

ওসমান এই সকল আলোচনা করিয়া রাজপুত্রের পুনর্জীবনে যত্নবান হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু আর কিছুও ছিল। আয়েষা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওসমান, সকলেই যেন তোমার মত স্বার্থপরতায় দূরদর্শী হয়। তাহা হইলে আর ধর্মে কাজ নাই।"

ওসমান কিঞ্চিৎকাল ইতস্তত করিয়া মৃদুতরস্বরে কহিলেন, "আমি যে পরম স্বার্থপর, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি।"

বলিতে পরাঙ্মুখ হন নাই দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত পত্রের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে, কানাইলালের সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :

"নরেন্দ্রনাথ নিজের আত্মরক্ষার্থে, তাহার সমস্ত সঙ্গীদের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; সেসন্সে দাঁড়াইবার অবসর পাইলে সে আরো ক্ষতি করিতে সমর্থ হইত, সেইজন্য কানাই-লাল ও সত্যেন্দ্রনাথ উহাকে পৃথিবী হইতে অপসারণ করে। এই স্থলে একজনের নিধনে, বহু লোকের উদ্ধার সাধন করা হইয়াছে।

"রাজসাক্ষীকে হত্যা 'খুন' বলিয়া পরিগণিত হইলেও, উহারা সহচরদিগের মঙ্গলের জন্যই অকুতোভয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে ; ইহা কখনও হীন বা কাপুরুষোচিত কর্ম্ম নহে—ইহা আত্মত্যাগের গৌরবে সমুজ্জ্বল এবং ইহাতে আত্মাহুতি আছে।

"গ্রীক বীর 'হারমোডিয়াস' (Harmodius) এবং 'এ্যারিসটোজিটনের' (Aristogeitin) * ন্যায় যদি বঙ্গবাসী-গণ তাঁহাদের হৃদয় সিংহাসনে, এই দুই জন বীরকে বসাইয়া

---

* খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০ অব্দে হারমোডিয়াস ও এ্যারিস্টোজিটন জেলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দেশদ্রোহীকে নিহত করিয়া প্রাণ দেন এবং অদ্যাপি সেইজন্য তাঁহারা গ্রীস দেশে সর্ব্বত্র পূজিত। কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বার এইরূপ কার্য্য করিয়া খ্যাত হন।

রাখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যে কি কেহ আপত্তি করিতে পারে ?"

"The shooting of the informer is indeed murder, but is self devotion. It is a case of his life against the lives of others and the two assasins resolved to sacrifice themselves for the sake of the rest.

"If the Bengalis like to enthrone those two young men (Kanailal and Satyendra Nath) in popular remembrance as another Harmodius, and Aristogeiton, it is not easy to see how any one could justly object to the action."

(Pioneer, 4th Sept., 1908).

সত্যনিষ্ঠ 'পাইওনিয়র' পত্রের ইংরাজ সম্পাদকের এই নির্ভিক উক্তিতে, কলিকাতার "ইংলিশম্যান", "ষ্টেটসম্যান" পত্রগুলি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়। অধিকন্তু দেশীয় সংবাদ পত্রগুলিকে, ঐরূপ লিখিলে "রাজদ্রোহ" হইত বলিয়া, দেশীয় কাগজগুলির সম্পাদকগণকে শাসাইয়া দেয়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্টের পর, জাতীয় বন্ধনমুক্তি হওয়ায়, এই বৎসর সর্ব্বপ্রথম কানাইলালের স্মৃতি পূজার

ব্যবস্থা করা হয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও "ষ্টেটসম্যান" ও "অমৃতবাজার পত্রিকার" 'জুজুর' ভয় দূর হয় নাই, ইহাই অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। 'ষ্টেটসম্যান' না হয় ইংরাজ পরিচালিত সংবাদপত্র কিন্তু অমৃত বাজার পত্রিকা যাহারা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র বলিয়া সর্ব্বদা গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই কার্য্য কখনও সমর্থন যোগ্য নহে। কানাইলালের 'স্মৃতি সভা'র বিশদ বিবরণ এক 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ব্যতীত, বঙ্গের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নিম্নে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' (Hindusthan Standard) পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত হইল :

"On this day thirty nine years ago, Kanailal paid the highest penalty for his fearless act in punishing a traitor to the cause of the motherland. In the roll of our revolutionary martyr the position of Kanai and his comrade Satyen is unique. The courage and resourcefulness of their action inside a British jail had had no precedent and their example was emulated some seventeen years later by another pair of heroes, Anantahari and Promoderanjan in Alipore Central Jail. On this memorable day, Bengal

should recall with pride that our patriotic tradition of self sacrifice has been built up by young idealists like Kanailal." (Hindusthan Standard, 10th November, 1947).

সংবাদপত্রের কথাগুলি আলোচনা করিতে করিতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি ; এইবার নরেন্দ্রনাথকে হত্যার পর আলিপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যার (Mr. Marr) তৎপরদিবস হইতে, প্রাথমিক তদন্ত করিবার সময়, কয়েকজন সাক্ষী তাহাকে যাহা বলেন, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

লিণ্টন তাহার সাক্ষ্যে বলে যে, সে একজন কয়েদি ; হিগিন্স গুলিতে আহত হইয়াছে শুনিয়া সে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের অফিস হইতে দৌড়াইয়া বাহির হয় এবং দেখিতে পায় যে, জেলার সাহেব ও হিগিন্স দৌড়াইয়া আসিতেছেন। পরে তাঁত কলের পাশের রাস্তাটি দিয়া যাইবার সময় দেখিতে পায় যে, ডাক্তার চাটার্জ্জি একজন লোকের সহায়তায় নরেন্দ্র গোস্বামীকে ধরিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাইতেছেন। হঠাৎ ডাক্তার বাবুর, পিছনে কানাইলাল দত্ত দৌড়াইয়া আসিয়া চিৎকার করিয়া বলে—"সকলে সরে যাও, নচেৎ গুলি কোরবো।" ডাক্তার বাবু নরেনকে লইয়া ছুটিতে লাগিলেন এবং তাহার পিছনে পিছনে কানাই ও সত্যেন দৌড়াইতে লাগিল।

অতঃপর লিণ্টন বলে যে, সে সত্যেনকে ধরিয়া ফেলে, কিন্তু তাহাকে ধরিবার সময় সে গুলি ছোড়ে এবং গুলি নরেনের শরীরে বিদ্ধ হয় এবং নরেন ড্রেনের মধ্যে পড়িয়া যায়। অতঃপর সে সত্যেনের হাত হইতে রিভলভারটি কাড়িয়া উত্তর দিকে ফেলিয়া দেয় এবং একজন ওয়ার্ডার তাহা কুড়াইয়া লয়।

ইতিমধ্যে কানাই দৌড়াইয়া, আসিয়া জেলারের দিকে রিভলভার লক্ষ করিতেছে দেখিয়া সে তাহার বাম হস্তখানি ধরিয়া ফেলে। কিন্তু কানাই রিভলভারের বাঁট দিয়া তাহার মাথায় আঘাত করায়, তাহার কপাল কাটিয়া যায়। লিণ্টন পিছন দিক দিয়া কানাইলালের দুইখানি হাত ধরিবার পূর্ব্বেই, সে নরেন্দ্রকে গুলি করে। অতঃপর আর একজন ওয়ার্ডার আসিয়া পড়ে এবং তাহারা দুই জনে কানাইকে ধরিয়া ফেলে।

হিগিন্স তাহার সাক্ষ্যে বলে যে, সত্যেন বার বার নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠায়। শনিবার বেলা একটার সময় নরেন সত্যেনের নিকট হাঁসপাতালে গিয়া কথাবার্ত্তা বলে, সে তখন তাহাদের নিকটেই ছিল। পরে নরেন আমাদের ঘরে চলিয়া যায় এবং তখন সে জানিতে পারে যে, সত্যেনও রাজসাক্ষী হইবে।

সোমবার দিন পুনরায় সত্যেন্দ্রনাথ যখন নরেন্দ্র গোস্বামীকে ডাকিয়া পাঠায়; তখন সে নরেনকে বলে যে "সত্যেনের মতলব

ভাল বলিয়া মনে হইতেছে না।” তদুত্তরে নরেন্দ্রনাথ বলে যে “সত্যেন অনেক কথা তাহাকে লিখিয়া দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে” এবং সে নরেনের সহিত যাইলে সুখী হইবে। নরেন্দ্র ও সে হাসপাতালে প্রবেশ করিতেই, তাহারা সেই স্থানে সত্যেন্দ্র ও কানাইকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে।

নরেন ও সত্যেন ডিস্পেনসারীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া খুব আস্তে আস্তে কথা বলিতে থাকে এবং সে বারান্দায় অপেক্ষা করে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর নরেন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বলে “ঈশ্বরের দোহাই—আমাকে বাঁচাও, মিঃ হিগিন্স।”

নরেনের কথায় হিগিন্স পিছনে চাহিয়া দেখে যে, কানাই দুইটি পিস্তল নরেনের দিকে এবং সত্যেন একটি পিস্তল হিগিন্সের দিকে লক্ষ করিয়া দৌড়াইয়া আসিতেছে।

কানাই চিৎকার করিয়া তাহাকে বলিতে থাকে “সরে যাও নচেৎ তোমাকেও গুলি করব।” হিগিন্স কানাইকে কাবু করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার হাত গুলিতে বিদ্ধ হওয়ায়, সে তাহাদের ধরিতে পারে নাই। আসামীরা তাহাকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায় এবং সে পড়িয়া যায়।

তাহারা চলিয়া গেলে, সে পুনরায় উঠে এবং নরেনের পশ্চাতে পশ্চাতে পাটের কল পর্য্যন্ত যায়। ইতিমধ্যে কানাই দুইবার নরেনকে গুলি করে এবং নরেন নর্দ্দামার মধ্যে পড়িয়া যায়। এই সময় লিণ্টন আসিয়া পড়ে ও কানাইয়ের নিকট হইতে

রিভলভার কাড়িয়া নেয়। সেই সময় নরেন মাথা তুলিয়া "বিদায়—বিদায়···শেষ···" প্রভৃতি দুই একটা কথা বলিবার চেষ্টা করে।

হাসপাতালের ডাক্তার বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি সোমবার প্রাতে নরেন্দ্র ও কানাইকে চুপি চুপি কথা বলিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যান। তিনি নরেন্দ্রকে একটু আড়ালে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"এ আপনার কেমন সাহস, একাকী হাসপাতালে আসিলেন—কেউ দেখে ফেল্লে আমাকে যে বিপদে পড়তে হবে?" তদুত্তরে নরেন্দ্র তাহাকে বলে "একটু দরকারী কাজ আছে, তাই এসেছি—মিঃ হিগিন্স আমার সঙ্গে আছেন।"

অতঃপর ডাঃ চ্যাটার্জ্জি সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই শুনিতে পান যে, কে যেন টোটা ছুড়িয়াছে। তিনি এই কথা শুনিয়া ডিস্পেন্সারীর বাহিরে আসিয়া কানাই ও নরেন দুই জনে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছে দেখিতে পান। তিনি তাহাদের ছাড়াইবার চেষ্টা করিবেন, এমন সময় কানাই একটা গুলি করে, তাহা ডাক্তারের কানের পাশ দিয়া চলিয়া যায়। তাহার পর কানাই ডাক্তারকে গুলি করিবে বলিয়া ভয় দেখাইলে, তিনি দৌড়াইয়া জেলারকে খবর দিতে চলিয়া যান।

জেলারকে সঙ্গে করিয়া ডাক্তার চাটার্জ্জি ফিরিয়া আসিলে নরেন্দ্র নর্দ্দামায় পড়িয়া আছে তিনি দেখিতে পান এবং তাহারা

সেইস্থান হইতে তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যান ; সেই সময় নরেন্দ্রের প্রাণ বাহির হইতেছিল। হাসপাতালে নরেনকে বহু প্রকারের ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু দু-তিন মিনিটের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়।

জেলের অধ্যক্ষ যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ, তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, রিভলভার দুইটি কি করিয়া হাসপাতালের মধ্যে আসিল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। গত কল্য সত্যেন্দ্রের সহিত যখন সরোজিনী ঘোষ, মনীন্দ্র নাথ বসু ও মহেশচন্দ্র বসু জেলে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন তখন তিনিও তথায় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সত্যেন্দ্র, অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকে তাহার অফিসের ভিতর আনান হয়, সেই স্থানে সরোজিনী ঘোষ প্রভৃতির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় আধঘণ্টা তাহাদের কথাবার্ত্তা হয় এবং তিনি সেই সময় তাহাদের প্রতি লক্ষ রাখেন এবং মধ্যে মধ্যে কয়েকখানি চিঠিও সহি করেন। তিনি তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ পরীক্ষা করেন নাই—কারণ 'মেট'ই সাধারণতঃ পোষাকাদি পরীক্ষা ও তল্লাসী করে।

আলিপুর জেলের মেডিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন ডেয়লি নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর মৃত্যুর পর তাহার দেহ পরীক্ষা করেন ; তিনিও সাক্ষ্য দান করেন।

অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডবলিউ, এ, ম্যর, যে সমস্ত সাক্ষ্য

গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধে কানাইলালের কিছু বলিবার আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, কানাইলাল বলেন যে, ইন্দ্রনাথ নন্দীর কথা সাক্ষীগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা নির্জ্জলা মিথ্যা এবং তিনটি রিভলভার ছিল বলিয়া, যাহারা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও সত্য নয়। ইন্দ্রনাথকে জড়াইবার জন্যই তিনটি রিভলভারের অবতারণা করা হইয়াছে; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, ইন্দ্রনাথ এই ঘটনার বিষয় কিছুই জানিতেন না—তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

ম্যাজিষ্ট্রেট—"তাহ'লে তুমি স্বীকার করছো যে, তোমরাই নরেনকে মেরেছ।"

কানাই—"হাঁ—আমি ও সত্যেন আমরা উভয়ই নরেনকে মেরেছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট—"কেন মেরেছ?"

কানাই—"কেন মেরেছি তার কোন কারণ বলতে পারবো না—(একটু চিন্তা করিয়া) না—কারণটাও বলা দরকার, নরেন দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক তাই তাহাকে খুন করেছি। (Because he proved a traitor to the country)

দুই দিনের মধ্যেই প্রাথমিক অনুসন্ধান পর্ব্ব শেষ হয় এবং মিঃ ম্যার মোকদ্দমাটি দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়া দেন। আলিপুরের দায়রা জজ মিঃ এফ, আর, রো (Mr. F. Roe. I. C. S) সাহেবের আদালতে, ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিচার

আরম্ভ হয়। সরকার পক্ষে উকিল ছিলেন আশুতোষ বিশ্বাস এবং সত্যেনের পক্ষে উকিল ছিলেন ব্যারিষ্টার মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জি এবং উকিল নরেন্দ্রকুমার বসু। কানাইলাল আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকিল নিযুক্ত করেন নাই এবং মামলা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ছিলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর আলিপুর সেসন্সে এই মোকদ্দমাটি হইবার কথা ছিল, কিন্তু জেলের মধ্যে কানাইলালের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া একটি ভূয়া সংবাদ কলিকাতায় রাষ্ট্র হইয়া যায়। এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবার পর সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস, মিঃ রো সাহেবের নিকট ৬ই সেপ্টেম্বর এই বলিয়া আবেদন করেন যে, আলিপুরের অতিরিক্ত জজ মিঃ বিচক্রফটের নিকট এই মামলার বিচার হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও তিনি সত্বর ইহা বিচার করিতে পারিবেন না; অথচ নানা-কারণে এই মামলা সত্বর নিষ্পত্তি করা বিশেষ প্রয়োজন।

আশুবাবুর আবেদনে মিঃ রো সাহেব স্বয়ং ইহা বিচার করিতে আরম্ভ করেন। এই মামলায় মিঃ জে, এন, স্লি ও এইচ, নিকলস্ নামক দুই জন ইউরোপিয়ান এবং বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, আশুতোষ দত্ত, ও বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য নামক তিন জন বাঙ্গালী জুরী নির্ব্বাচিত হন। বিপিনবাবু অসুস্থ্য হইয়া পড়ায়, তাহার স্থলে শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় জুরী হন।

সোমবার ৭ই তারিখে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে ইচ্ছাপূর্ব্বক

জেলের মধ্যে হত্যা এবং লিণ্টন ও হিগিন্সকে হত্যার চেষ্টা করিবার জন্য কানাইলাল দত্তের, জুরীদের সমক্ষে বিচার আরম্ভ হয়। বিচারের সময় আদালত গৃহে খুব কড়া পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়; একখানি ঠিকা গাড়ি করিয়া কানাই ও সত্যেনকে এবং কয়েদিদের গাড়ি করিয়া সাক্ষীদের আদালতে লইয়া আসা হয়।

জজ সাহেব আসন গ্রহণ করিলে, সত্যেন্দ্রনাথের উকিল নরেন্দ্রনাথ বসু একখানি দরখাস্ত করিয়া বলেন যে, আইন অনুযায়ী বিচার করিবার এই আদালতের কোন ক্ষমতা নাই। সরকারী উকিল আশুবাবু তাহার প্রতিবাদ করিলে, জজ উক্ত দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন এবং যথারীতি বিচার আরম্ভ হয়।

প্রথমে কানাই ও সত্যেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি পড়িয়া শুনান হইলে, জজ সাহেব তাহাদিগকে দোষী কি নির্দোষী এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে কানাই নির্ভিক ভাবে বলেন যে "আমি নির্দোষ বলিতে অস্বীকার করি" (I decline to plead not guilty.)

জজ—"তুমি কি কোন উকিল দিবে?"

কানাই—"আজ্ঞে না—ধন্যবাদ।"

জজ—"তুমি কি ইচ্ছা কর না যে,আদালত তোমার পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকিল নিযুক্ত করে?"

কানাই—"না"

জজ—"তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা কি ঠিক ?"

কানাই—"আজ্ঞে হাঁ, সবই ঠিক—কেবল সত্যেনের সম্বন্ধে আমি তাড়াতাড়িতে একটা ভুল বলিয়া ফেলিয়াছি। সত্যেন সেখানে ছিল বটে, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে লিপ্ত ছিল না ; আমি একাই নরেন্দ্র গোস্বামীকে খুন করিয়াছি।"

জজ—"এই রিভলভার তুমি কোথায় পাইয়াছিলে ?"

কানাই—"ক্ষুদিরামের প্রেতাত্মা ইহা আমাকে দিয়া গিয়াছে" (The Spirit of Khudiram supplied me with the revolver.)

জজ—"জুরী নির্ব্বাচনে তোমার আপত্তি আছে ?"

কানাই— (নিরুত্তর থাকেন)

জজ—"তুমি আর কিছু কি বলিবে ?"

কানাই—"আজ্ঞে না—আমার যা বলবার তা আগেই আমি বলেছি।"

অতঃপর সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস মামলার উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, কানাই ও সত্যেন্দ্র ইহাদের মধ্যে যে কেহ একজন যে, গুলি করিয়া নরেন্দ্রকে হত্যা করিয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। এক্ষণে উহারা উভয়ে ষড়যন্ত্র করিয়া হত্যা করিয়াছে বলিয়া যদি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে দুইজনেই অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে ; অধিকন্তু রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যত্র আর একটি মামলার বিচারও চলিতেছে।

নরেন্দ্র বসু আশুবাবুর * কথায় আপত্তি করিয়া বলেন—সত্যেন্দ্র যে নরেন্দ্র গোস্বামীকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই ; সুতরাং উভয়ে একযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এই কথা বলা ঠিক নয়। সরকারী উকিল এই বিষয়ে আরো প্রমাণ উপস্থাপিত করিবেন বলায়, জজ সাহেব নরেন বাবুর আপত্তি অগ্রাহ্য করেন।

সোমবার ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে বুধবার ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কানাই ও সত্যেনের মামলায় সাক্ষিদের জেরা করিয়া, রায় দেওয়া হয়। এই তিন দিনের মধ্যে শ্যামাচরণ খান্না, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লি, ইন্সপেক্টর বিনোদবিহারী গুপ্ত, গোপাল মাইতি, প্রসিদ্ধ বন্দুকওয়ালা ম্যাণ্টন কোম্পানীর (Messrs Manton & Co.) ব্রাউন সাহেব প্রভৃতির সাক্ষ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসের সহিত ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জির বহু বাদানুবাদ হয় এবং আশুবাবুকে এই মামলা না করিবার জন্য, কয়েকখানি পত্রও বিপ্লবীগণ বাহির হইতে প্রেরণ করেন। দেশদ্রোহীকে শাস্তি দিয়া কানাই ও সত্যেন ধর্ম্মকার্য্য করিয়াছে ; সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, তিনি যেন তাহার মৃত্যু ডাকিয়া না আনেন, এই ভাবের লাল

* ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী, তিনি খুলনা জেলার চারুচন্দ্র বসু নামক জনৈক যুবকের রিভলভারের গুলিতে, আদালত প্রাঙ্গনে নিহত হন।

কালিতে লিখিত বহু প্রকারের ভীতি-প্রদর্শক পত্র, তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আশুবাবু এই সমস্ত গ্রাহ্য করেন নাই।

শ্যামাচরণ খান্না ঘটনাস্থলের একটি নক্সা (drawing) আঁকিয়া আদালতে দাখিল করেন এবং বার্লি সাহেব কানাই ও সত্যেনের বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছে, তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। সরকারী উকিল আশুবাবু, ইহাদের বিরুদ্ধে, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী যে স্বীকারোক্তি করিয়াছিল, তাহাও দাখিল করিতে চাহিলে, ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জির প্রতিবাদে, জজ সাহেব তাহা দাখিল করিতে দেন নাই।

ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জি, ইন্সপেক্টর বিনোদবিহারী গুপ্তকে জেরা করায় তিনি বলেন যে, বহু অনুসন্ধান করিয়াও তিনি পূর্ব্ব কথিত তৃতীয় রিভলভারটীর কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই।

জজ সাহেব কানাইলালকে বলেন যে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সাক্ষীকে তিনি যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; কিন্তু কানাই বলেন যে, তাহার আর প্রশ্ন করিবার কিছুই নাই।

অতঃপর গোপাল মাইতি নামক জেলের একজন কয়েদি তাহার সাক্ষ্যে বলে যে "৩১শে আগষ্ট ঘটনার দিন বোমার মত একটি উচ্চ শব্দ শুনিয়া আমি বাহির হইবামাত্র দুই জনকে (কানাই ও সত্যেন) ধস্তাধস্তি করিতে দেখি।" গোপালের এই কথায় সরকারী উকিল আশুবাবু জজকে বলেন যে, এই

সাক্ষী আমাদের বিরুদ্ধে চলিয়া গিয়াছে। ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জি তাহার এই উক্তিতে আপত্তি জানাইয়া, গোপালকে জেরা করিতে আরম্ভ করেন।

জেরার উত্তরে গোপাল মাইতি বলে যে, ডাকাতি ও খুনের মামলায় তাহার দশ বৎসর জেল হয়, কিন্তু জেলের মধ্যে সদভাবে থাকিবার জন্য, তাহাকে 'মেটের' অর্থাৎ অন্য কায়েদীদের কাজ-কর্ম্ম দেখিবার কার্য্য দেওয়া হইয়াছে। ঘটনার দিন গোপাল, কানাই বা সত্যেনের হাতে সে কোন রিভলভার দেখে নাই। সে সত্যেনবাবুকে বারান্দায় বেড়াইতে দেখিয়াছিল; কানাইবাবু যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে নরেন কোথায়, তখন নরেন্দ্র গোস্বামী তাহার কাছে ছিল না নরেন্দ্রনাথকেও সে যখন দেখে, তখন তাহার মুখে কোন রূপ দাগ সে দেখিতে পায় নাই; বরং হিগিন্স কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিয়াছিল ইহা সে দেখিতে পায়।

অনুরূপ দাস নামক আর একজন কায়েদীও, তাহার সাক্ষ্যে বলে যে, ঘটনার দিন সে সত্যেন্দ্রনাথকে বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, তিনি, অনুরূপকে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে তাহার কাছে পাঠাইয়া দিবার জন্য বলিয়াছিলেন। জেরার উত্তরে সে আরো বলে যে, কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথকে কখনও খোলাখুলিভাবে ঘনিষ্ঠতার সহিত মিশিতে সে দেখে নাই।

ম্যাণ্টন কোম্পানীর মিঃ ব্রাউন রিভলভারের গুলির সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন; তিনি বলেন সম্ভবতঃ তিনটি মাত্র গুলি করা হইয়াছিল।

বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় নামক আর একজন কয়েদীও তাহার সাক্ষে বলে যে, সত্যেন্দ্রনাথের হাতে রিভলভার সে দেখে নাই।

জেলের অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন যে, তিনি কানাই লালকে নরেন্দ্রের উপর গুলি চালাইতে সচক্ষে দেখিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের হাতে একটি রিভলভার ছিল বলিয়া তিনি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত রিভলভারটি তিনি নিজে সত্যেনের হাতে দেখেন নাই।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কানাইলাল ডুপ্লে কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা দেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি: উক্ত কলেজের ফরাসী অধ্যক্ষ কানাইলালের কলেজের স্বভাবচরিত্র খুব ভাল ছিল বলিয়া সাক্ষ্য দেন এবং বলেন যে, কানাই পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল এবং কলেজের পরীক্ষার প্রতি বিষয়ে খুব ভাল নম্বর পাইত।

ইউরোপীয় কয়েদী হিগিন্স মামলার অনুসন্ধানের সময় যেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহারই পুনরুক্তি করে। ডাক্তার বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অমুল্য নামক জনৈক কয়েদীও সাক্ষ্য দেয়।

জজ সাহেব পুনরায় কানাইলালকে তাহার কিছু বলিবার

১৪

মহোৎসব উপস্থিত। আজ কতলু খাঁর জন্মদিন। দিবসে রঙ্গ, নৃত্য, দান, আহার, পান ইত্যাদিতেই সকলে ব্যাপৃত ছিল। রাত্রিতে ততোধিক। যথায় যাও, তথায় কেবল দীপমালা, গীতবাদ্য, গন্ধবারি, পান, পুষ্প, বাজি। নবাবের বিহারগৃহ প্রমোদময়।

এক সুন্দরী বেশবিন্যাস সমাপন করিয়া, কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন। আজ কাহারও কোথাও যাইতে বাধা ছিল না। সুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর, স্থির চক্ষুতে কঠোর জ্বালা। তিনি বিমলা।—বিমলা এক সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন। কক্ষের এক প্রান্তভাগে একখানি পালঙ্কের পার্শ্বে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "তিলোত্তমা, আমি আসিয়াছি।"

তিলোত্তমা কোন উত্তর করিলেন না। তিনি রোদন করিতেছিলেন। বিমলা কহিলেন, "তিলোত্তমা, একেবারে নিরাশ হও কেন? এখনও আমাদিগের প্রাণ আছে, ধর্ম আছে; যতদিন প্রাণ আছে, ততদিন ধর্ম রাখিব।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "তবে মা, এই সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেল; তুমি অলঙ্কার পরিয়াছ, আমার চক্ষুশূল হইয়াছে।"

বিমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাছা, আমার সকল আভরণ না দেখিয়া আমাকে তিরস্কার করিও না।" এই বলিয়া বিমলা নিজ বসন-মধ্যে লুক্কায়িত এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিলেন। তিলোত্তমা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোথায় পাইলে?"

বি। কাল একজন নূতন দাসী আসিয়াছে, দেখিয়াছ?

তি। দেখিয়াছি—আশমানী আসিয়াছে।

বি। আশমানীর দ্বারা ইহা অভিরাম স্বামীর নিকট হইতে আনাইয়াছি।

তিলোত্তমা নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। বিমলা কহিলেন, "স্থির হইয়া শুন, আমি তোমার নিষ্কৃতির উপায় করিয়াছি।"

তিলোত্তমা আগ্রহ সহকারে বিমলার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বিমলা তিলোত্তমার হস্তে ওসমানের অঙ্গুরী দিয়া কহিলেন, "এই অঙ্গুরী ধর। নৃত্যগৃহে যাইও না। অর্ধরাত্রে অন্তঃপুরদ্বারে যাইও; তথায় আর এক ব্যক্তি তোমাকে এইরূপ আর এক অঙ্গুরী দেখাইবে। তুমি নির্ভয়ে তাহার সহিত গমন করিও; যেখানে লইয়া যাইতে বলিবে, সে তোমাকে তথায় লইয়া যাইবে। তুমি তাহাকে অভিরাম স্বামীর কুটীরে লইয়া যাইতে কহিও। আমি অন্য উপায়ে বাহির হইয়া কাল প্রাতে তোমার সহিত মিলিত হইব।"

তিলোত্তমা কিঞ্চিৎ সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, "দেখিতেছি, তুমি দুর্গের সকল সংবাদ পাইয়াছ, আমাদিগের আত্মীয়বর্গ কোথায়? কে কেমন আছে, বলিয়া যাও।"

বিমলা দেখিলেন, এ বিপদ্‌সাগরেও জগৎসিংহ তিলোত্তমার মনোমধ্যে জাগিতেছেন। বিমলা উত্তর করিলেন, "জগৎসিংহ এই দুর্গ মধ্যেই আছেন; তিনি শারীরিক কুশলে আছেন।"

তিলোত্তমা নীরব হইয়া রহিলেন।

বিমলা চক্ষু মুছিতে মুছিতে তথা হইতে গমন করিলেন।

তখন তিলোত্তমা ভাবিতে লাগিলেন, "মুক্ত হইলেই বা কোথা যাইব? আর কি পিতৃগৃহ আছে?···রাজপুত্র কি কারাগারে আছেন? একবার তাঁহার সাক্ষাৎও কি পাইতে পারিব না?"—তিলোত্তমা অবিরত নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

১৫

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, তিলোত্তমা অন্তঃপুর-দ্বার পর্যন্ত

গেলেন। সকলেই প্রমোদে ব্যস্ত ; কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। দ্বারে প্রহরীর বেশধারী একজন তিলোত্তমাকে দেখিয়া কহিল, "আপনার হাতে আঙ্গটি আছে ?"

তিলোত্তমা সভয়ে বিমলা প্রদত্ত অঙ্গুরী দেখাইলেন। প্রহরী নিজ হস্তস্থ অঙ্গুরী তিলোত্তমাকে দেখাইল ; পরে কহিল, "আমার সঙ্গে আসুন, কোন চিন্তা নাই।"

তিলোত্তমা চঞ্চল চিত্তে প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রহরী দুর্গপ্রান্তে ফটকে আসিয়া কহিল, "এখন কোথায় যাইবেন, আজ্ঞা করুন।"

তিলোত্তমার মুখ হইতে কি কথা বাহির হইল, তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না ; প্রহরীর কর্ণে অর্ধস্পষ্ট "জগৎসিংহ" শব্দটি প্রবেশ করিল।

প্রহরী দুর্গমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল। তিলোত্তমা কলের পুত্তলীর ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রহরী কারাগার-দ্বারে গমন করিয়া কারাগারের প্রহরীকে ওসমানের সাঙ্কেতিক অঙ্গুরী দেখাইল। সে তৎক্ষণাৎ নতশির হইয়া কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিল। আপনার অজ্ঞাতসারে তিলোত্তমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজপুত্র প্রথমে তিলোত্তমাকে চিনিতে পারিলেন না। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, চিনিতে পারিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা ?—এখানে কি অভিপ্রায়ে ?—ফিরিয়া যাও, পূর্বকথা বিস্মৃত হও।"

তিলোত্তমা সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

জগৎসিংহ প্রহরীকে ডাকিলেন। তিলোত্তমার সঙ্গী তাঁহার নিকটে আসিল। জগৎসিংহ তাহাকে কহিলেন, "ইনি অকস্মাৎ মূর্ছিতা হইয়াছেন। ঝটিতি নবাবপুত্রীর নিকট সংবাদ দাও।"

প্রহরী দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। রাজপুত্র সাধ্যমত তিলোত্তমার

শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিলোত্তমার ক্রমে অল্প অল্প চেতনা হইতে লাগিল। সেই ক্ষণেই মুক্ত দ্বারপথে জগৎসিংহ দেখিতে পাইলেন যে, দাসী সঙ্গে আয়েষা স্বয়ং আসিতেছেন।

আয়েষা তিলোত্তমাকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজপুত্র, ইনি কে?"

রাজপুত্র কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।"

আয়েষা তিলোত্তমাকে কোলে করিয়া বসিলেন। তাঁহার শুশ্রূষায় তিলোত্তমা সম্পূর্ণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিলেন। আয়েষা তিলোত্তমার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "ভগিনী, তুমি এখন অতি দুর্বল, আমার গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিবে চল। রাত্রি অবসান হইতে না হইতে যেখানে যাইবে, সেইখানে দাসী দিয়া পাঠাইয়া দিব।" তিলোত্তমা দাসীর স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন।

আয়েষা রাজপুত্রের নিকট বিদায় লইতে গিয়া শয্যার উপরে আসিয়া বসিলেন। জগৎসিংহ নিকটে দাঁড়াইলেন। স্নেহময়ী রমণী রাজপুত্রের মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, "কুমার, আমাকে পর-জ্ঞান করিও না। যদি সাহস দাও, তবে বলি—বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা কি—"

আয়েষার কথা শেষ হইতে না হইতেই রাজকুমার কহিলেন, "ও কথায় আর কাজ কি? সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে।"

উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন। রাজপুত্র অকস্মাৎ দেখিলেন, আয়েষা কাঁদিতেছেন। বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ কি আয়েষা? তুমি কাঁদিতেছ?"

আয়েষা ধীরে ধীরে কহিলেন, "যুবরাজ, কারাগারে তোমাকে একাকী যে এ মনঃপীড়া ভোগ করিতে রাখিয়া যাইব, তাহা পারিতেছি না। তুমি আমার সঙ্গে বাহিরে আইস; অশ্বশালায় অশ্ব আছে, দিব; অদ্য রাত্রেই নিজ শিবিরে ফিরিয়া যাইও।"

রাজপুত্র যারপরনাই চমৎকৃত হইলেন। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "আয়েষা, তুমি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিবে?"

আয়েষা কহিলেন, "এই দণ্ডে।"

রাজপুত্র। এ কথা প্রকাশ হইলে, তুমি তোমার পিতার নিকট যন্ত্রণা পাইবে।

আয়েষা। তাহাতে ক্ষতি কি?

রাজপুত্র। আয়েষা, আমি যাইব না।

আয়েষা ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রা। তোমার নিকট প্রাণ পর্যন্ত পাইয়াছি, তোমার যাহাতে যন্ত্রণা হইবে, তাহা আমি কদাচ করিব না।

আয়েষা নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষে দরদর ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রাজপুত্র কহিলেন, "আয়েষা, রোদন করিতেছ কেন?"

আয়েষা রাজপুত্রের কথার উত্তর না করিয়া অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিলেন। ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, আমি আর কাঁদিব না।"

রাজপুত্র প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। উভয়ে মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

এক ব্যক্তি আসিয়া উভয়ের নিকট দাঁড়াইল; কেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পরে ক্রোধকম্পিত স্বরে আগন্তুক কহিল, "নবাবপুত্রী, এ উত্তম।"

উভয়ে মুখ তুলিয়া দেখিলেন,—ওসমান।

আয়েষা স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "কি উত্তম, ওসমান?"

ওসমান। নিশীথে একাকিনী বন্দীর জন্য কারাগারে অনিয়ম প্রবেশ নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম।

শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিলোত্তমার ক্রমে অল্প অল্প চেতনা হইতে লাগিল। সেই ক্ষণেই মুক্ত দ্বারপথে জগৎসিংহ দেখিতে পাইলেন যে, দাসী সঙ্গে আয়েষা স্বয়ং আসিতেছেন।

আয়েষা তিলোত্তমাকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজপুত্র, ইনি কে?"

রাজপুত্র কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।"

আয়েষা তিলোত্তমাকে কোলে করিয়া বসিলেন। তাঁহার শুশ্রূষায় তিলোত্তমা সম্পূর্ণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিলেন। আয়েষা তিলোত্তমার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "ভগিনী, তুমি এখন অতি দুর্বল, আমার গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিবে চল। রাত্রি অবসান হইতে না হইতে যেখানে যাইবে, সেইখানে দাসী দিয়া পাঠাইয়া দিব।" তিলোত্তমা দাসীর স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন।

আয়েষা রাজপুত্রের নিকট বিদায় লইতে গিয়া শয্যার উপরে আসিয়া বসিলেন। জগৎসিংহ নিকটে দাঁড়াইলেন। স্নেহময়ী রমণী রাজপুত্রের মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, "কুমার, আমাকে পর-জ্ঞান করিও না। যদি সাহস দাও, তবে বলি—বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা কি—"

আয়েষার কথা শেষ হইতে না হইতেই রাজকুমার কহিলেন, "ও কথায় আর কাজ কি? সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে।"

উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন। রাজপুত্র অকস্মাৎ দেখিলেন, আয়েষা কাঁদিতেছেন। বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ কি আয়েষা? তুমি কাঁদিতেছ?"

আয়েষা ধীরে ধীরে কহিলেন, "যুবরাজ, কারাগারে তোমাকে একাকী যে এ মনঃপীড়া ভোগ করিতে রাখিয়া যাইব, তাহা পারিতেছি না। তুমি আমার সঙ্গে বাহিরে আইস; অশ্বশালায় অশ্ব আছে, দিব; অদ্য রাত্রেই নিজ শিবিরে ফিরিয়া যাইও।"

রাজপুত্র যারপরনাই চমৎকৃত হইলেন। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "আয়েষা, তুমি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিবে?"

আয়েষা কহিলেন, "এই দণ্ডে।"

রাজপুত্র। এ কথা প্রকাশ হইলে, তুমি তোমার পিতার নিকট যন্ত্রণা পাইবে।

আয়েষা। তাহাতে ক্ষতি কি?

রাজপুত্র। আয়েষা, আমি যাইব না।

আয়েষা ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রা। তোমার নিকট প্রাণ পর্যন্ত পাইয়াছি, তোমার যাহাতে যন্ত্রণা হইবে, তাহা আমি কদাচ করিব না।

আয়েষা নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষে দরদর ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রাজপুত্র কহিলেন, "আয়েষা, রোদন করিতেছ কেন?"

আয়েষা রাজপুত্রের কথার উত্তর না করিয়া অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিলেন। ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, আমি আর কাঁদিব না।"

রাজপুত্র প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। উভয়ে মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

এক ব্যক্তি আসিয়া উভয়ের নিকট দাঁড়াইল; কেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পরে ক্রোধকম্পিত স্বরে আগন্তুক কহিল, "নবাবপুত্রী, এ উত্তম।"

উভয়ে মুখ তুলিয়া দেখিলেন,—ওসমান।

আয়েষা স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "কি উত্তম, ওসমান?"

ওসমান। নিশীথে একাকিনী বন্দীর জন্য কারাগারে অনিয়ম প্রবেশ নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম।

ওসমানের মুখপানে চাহিয়া আয়েষা গর্বিতস্বরে উত্তর করিলেন, "নিশীথে একাকিনী কারাগারমধ্যে আসিয়া এই বন্দীর সহিত আলাপ করা আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।"

ওসমান বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন; কহিলেন, "প্রয়োজন আছে কিনা, কাল প্রাতে নবাবের মুখে শুনিবে।"

আয়েষা পূর্ববৎ কহিলেন, "যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন উত্তর দিব। তোমার চিন্তা নাই।"

ওসমান। আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি?

আয়েষা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্থির দৃষ্টিতে ওসমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া অতি পরিষ্কার স্বরে কহিলেন, "ওসমান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।"

যদি তন্মুহূর্তে কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত, তবে রাজপুত্র কি পাঠান অধিকতর চমকিত হইতেন না। আয়েষার নীরব রোদন এখন রাজপুত্র বুঝিতে পারিলেন। ওসমান নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

আয়েষা পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "শুন, ওসমান, এতক্ষণ একাকিনী কি কথা বলিতেছিলাম। বলিতেছিলাম, আমি বন্দীকে কারামুক্ত করিয়া দিব; পিতার অশ্বশালা হইতে অশ্ব দিব; বন্দী পিতৃ-শিবিরে এখনই চলিয়া যাউন। বন্দী নিজে পলায়নে অস্বীকৃত হইলেন। নচেৎ তুমি এতক্ষণ ইঁহার নখাগ্রও দেখিতে পাইতে না।"

আয়েষা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া অন্য প্রকার স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ওসমান, এ-সকল কথা বলিয়া তোমাকে ক্লেশ দিতেছি, অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি আমায় স্নেহ কর, আমি তোমায় স্নেহ করি; এ আমার অনুচিত।"

পরে জগৎসিংহের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, তুমিও

অপরাধ ক্ষমা কর। যদি ওসমান আজ আমাকে মনঃপীড়িত না করিতেন, তবে এ কথা কখনও মনুষ্য-কর্ণগোচর হইত না।"

রাজপুত্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ওসমানও কথা কহিলেন না। আয়েষা দাসীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা না করিয়া একাকিনী বহির্গত হইলেন। ওসমান নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

১৬

সেই রজনীতে কতলু খাঁ নিজ বিলাসগৃহে নৃত্যগীত-কৌতুকে মত্ত ছিলেন। রমণীগণ কেহ নাচিতেছে, কেহ গায়িতেছে, কেহ বাদ্য করিতেছে; অপর সকলে কতলু খাঁকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া শুনিতেছে। বিমলা কতলু খাঁর পার্শ্বে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাঁহার হাতে সুরাপাত্র তুলিয়া দিতেছেন। বিমলা গায়িকাদিগের সহিত গায়িতেছেন। কি সুর! কি ধ্বনি!...বিমলা উঠিয়া নাচিতেছেন। কি সুন্দর! কিবা ভঙ্গী!...সুরাস্বাদ-প্রমত্ত কতলু খাঁ বিমলাকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি কোথা প্রিয়তমে!"

বিমলা কতলু খাঁর স্কন্ধে এক বাহু দিয়া কহিলেন, "দাসী শ্রীচরণে।"—অপর করে তাঁহার বক্ষস্থলে আমূল তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসাইয়া দিলেন।

"পিশাচী—শয়তানী!" বলিয়া কতলু খাঁ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। "পিশাচী নহি—শয়তানী নহি—বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা স্ত্রী।"—এই বলিয়া বিমলা কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন।

কতলু খাঁর কথা বলিবার শক্তি দ্রুত রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি সাধ্যমত চীৎকার করিতে লাগিলেন। বিবিরা যথাসাধ্য চীৎকার করিতে লাগিলেন। বিমলাও চীৎকার করিতে করিতে ছুটিলেন। প্রহরী ও খোজাগণ চীৎকার শুনিয়া ও বিমলার ত্রস্তভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

বিমলা কহিলেন, "সর্বনাশ হইয়াছে। শীঘ্র যাও, কক্ষমধ্যে মোগল প্রবেশ করিয়াছে, বুঝি নবাবকে খুন করিল।"

প্রহরী ও খোজাগণ ঊর্ধ্বশ্বাসে কক্ষাভিমুখে ছুটিল। বিমলাও ঊর্ধ্বশ্বাসে দ্বারাভিমুখে পলায়ন করিলেন। ফটকের একজন প্রহরী বিমলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও, কোথা যাও?"

তখন অন্তঃপুরমধ্যে মহা কোলাহল উঠিয়াছে। বিমলা কহিলেন, "বসিয়া কি করিতেছ, গোলযোগ শুনিতেছ না?"

প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের গোলযোগ?"

বিমলা কহিলেন, "অন্তঃপুরে সর্বনাশ হইয়াছে, নবাবের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে।"

প্রহরিগণ ফটক ফেলিয়া দৌড়িল; বিমলা নির্বিঘ্নে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বিমলা কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে, অভিরাম স্বামী এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছেন। বিমলা তাঁহার নিকট যাইবামাত্র তিনি কহিলেন, "আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইতেছিলাম; দুর্গমধ্যে কোলাহল কিসের?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "আমি বৈধব্য-যন্ত্রণার প্রতিশোধ লইয়া আসিয়াছি। এখানে আর অধিক কথায় কাজ নাই। তিলোত্তমা আশ্রমে গিয়াছে তো?"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "তিলোত্তমা অগ্রে অগ্রে আশমানীর সহিত যাইতেছে।"

এই বলিয়া উভয়ে দ্রুতবেগে চলিলেন; অচিরে কুটীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ক্ষণপূর্বে তিলোত্তমা তথায় আসিয়াছেন।

তিলোত্তমা অভিরাম স্বামীর পদযুগলে প্রণত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অভিরাম স্বামী তাঁহাকে স্থির করিয়া কহিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় তোমরা

দুরাত্মার হাত হইতে মুক্ত হইলে, এখন আর তিলার্ধ এদেশে তিষ্ঠান নহে। আমরা অদ্য রাত্রিতেই এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাই চল।"

সকলেই এ পরামর্শে সম্মত হইলেন।

১৭

বিমলার পলায়নের ক্ষণমাত্র পরেই একজন দূত অতিব্যস্তে জগৎ-সিংহের কারাগারমধ্যে আসিয়া কহিল, "যুবরাজ, নবাব-সাহেবের মৃত্যুকাল উপস্থিত, তিনি আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।"

যুবরাজ চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সে কি ?"

দূত কহিল, "অন্তঃপুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিয়া নবাব-সাহেবকে আঘাত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। প্রাণত্যাগের আর বিলম্ব নাই, আপনি ঝটিতি চলুন, নচেৎ সাক্ষাৎ হইবে না।"

যুবরাজ দূতের সহিত অন্তঃপুরে গমন করিয়া দেখিলেন, কতলু খাঁর জীবন-প্রদীপ সত্য সত্যই নির্বাণ হইয়া আসিতেছে। চতুর্দিকে ওসমান, আয়েষা, মুমূর্ষুর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণ, পত্নী, দাসী, অমাত্যবর্গ প্রভৃতি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। প্রায় সকলে উচ্চরবে কাঁদিতেছেন। আয়েষার নয়নধারায় মুখ প্লাবিত হইতেছে; নিঃশব্দে পিতার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

যুবরাজ প্রবেশমাত্র, একজন অমাত্য তাঁহাকে কতলু খাঁর নিকটে লইয়া গিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, "যুবরাজ জগৎসিংহ আসিয়াছেন।"

কতলু খাঁ ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমি শত্রু; মরি;—রাগ দ্বেষ ত্যাগ। বালক সব—যুদ্ধ—কাজ—নাই—সন্ধি। আপনি—মুক্ত—জগদীশ্বর—মঙ্গল—।"

আয়েষা মুখ অবনত করিয়া পিতাকে কি কহিয়া দিলেন। কতলু খাঁ রাজপুত্রের দিকে চাহিয়া শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিতে লাগিলেন,

"বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা—সাধ্বী—তুমি দেখিও। এই ক—কন্যার—মত —পবিত্রা—তুমি—উঃ—বড় তৃষা—যাই যে—আয়েষা !"

আর কথা সরিল না; কন্যার নাম মুখে থাকিতে থাকিতে নবাব কতলু খাঁর প্রাণবিয়োগ হইল।

১৮

কারামুক্ত হইয়া জগৎসিংহ পিতৃশিবিরে গমন করিয়া মোগল-পাঠানে সন্ধি করাইলেন। পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও উৎকলাধিকারী হইয়া রহিলেন।

পরিশেষে রাজপুতসেনার পাটনায় যাত্রার সময় আগত হইলে, জগৎসিংহ এক দিবস পাঠান-দুর্গে ওসমান প্রভৃতির নিকট বিদায় লইতে গমন করিলেন। ওসমানের নিকট বিদায় লইয়া রাজপুত্র আয়েষার নিকট বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে চলিলেন এবং একজন অন্তঃপুর-রক্ষী-দ্বারা তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন। খোজা কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, "নবাবপুত্রী বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না, অপরাধ মার্জনা করিবেন।"

জগৎসিংহ ক্ষুণ্নমনে আত্মশিবিরাভিমুখ হইলেন। দুর্গদ্বারে দেখিলেন, ওসমান তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। ওসমান কহিলেন, "আপনার সহিত বিশেষ কথা আছে, সহচরদিগকে অগ্রসর হইতে অনুমতি করিয়া একাকী আমার সঙ্গে আসুন।"

রাজপুত্র বিনা সঙ্কোচে একা অশ্বারোহণে ওসমানের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ওসমান এক নিবিড় শালবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনের মধ্যস্থলে এক ভগ্ন অট্টালিকা। শালবৃক্ষে ঘোটক বন্ধন করিয়া ওসমান রাজপুত্রকে সেই অট্টালিকার মধ্যে লইয়া গেলেন। অট্টালিকা মনুষ্যশূন্য। মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তাহার এক

পার্শ্বে একটি কবর প্রস্তুত রহিয়াছে, অথচ শব নাই ; অপর পার্শ্বে চিতা-সজ্জা রহিয়াছে, অথচ কোন মৃতদেহ নাই।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সকল কি ?"

ওসমান কহিলেন, "এ-সকল আমার আজ্ঞাক্রমে হইয়াছে। আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে মহাশয় আমাকে এই কবরমধ্যে সমাধিস্থ করিবেন ; যদি আপনি দেহত্যাগ করেন, তবে এই চিতায় ব্রাহ্মণদ্বার আপনার সৎকার করাইব।"

রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ-সকল কথার তাৎপর্য কি ?"

ওসমান। এ পৃথিবীতে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, একজন এইখানে প্রাণত্যাগ করিব।

রাজপুত্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন ; কহিলেন, "আপনার কি অভিপ্রায় ?"

ওসমান কহিলেন, "সশস্ত্র আছ, আমার সহিত যুদ্ধ কর।"

এই বলিয়া ওসমান অসিহস্তে জগৎসিংহকে আক্রমণ করিলেন। রাজপুত্র অগত্যা কোষ হইতে অসি বাহির করিয়া কেবল আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। ওসমানের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইল। তিনি কাতরস্বরে কহিলেন, "ওসমান, ক্ষান্ত হও, আমি পরাভব স্বীকার করিলাম।"

ওসমান উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "এ তো জানিতাম না যে, রাজপুত-সেনাপতি মরিতে ভয় পায়। যুদ্ধ কর, আমি তোমাকে বধ করিব, ক্ষমা করিব না। তুমি জীবিত থাকিতে আয়েষাকে পাইব না।"

রাজপুত্র কহিলেন, "আমি আয়েষার অভিলাষী নহি।"

ওসমান অসি ঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "তুমি আয়েষার অভিলাষী নও, আয়েষা তোমার অভিলাষী। যুদ্ধ কর, ক্ষমা নাই।"

রাজপুত্র অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তুমি অসময়ে আমার উপকার করিয়াছ, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

ওসমান সক্রোধে রাজপুত্রকে পদাঘাত করিলেন, কহিলেন, "যে সিপাহী যুদ্ধ করিতে ভয় পায়, তাহাকে এইরূপে যুদ্ধ করাই।"

রাজকুমারের আর ধৈর্য রহিল না। শীঘ্রহস্তে ত্যক্ত অসি ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া, প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া পাঠানকে আক্রমণ করিলেন। সে দুর্দম প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া ওসমান ভূমিশায়ী হইলেন। রাজপুত্র তাঁহার বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া কহিলেন, "কেমন, সমরসাধ মিটিয়াছে তো?"

ওসমান কহিলেন, "জীবিত থাকিতে নহে।"

রাজপুত্র। এখনই তো জীবন শেষ করিতে পারি।

ওসমান। কর, নচেৎ তোমার শত্রু জীবিত থাকিবে।

রা। থাকুক, রাজপুত তাহাতে ডরে না।

এই বলিয়া জগৎসিংহ একে একে ওসমানের সকল অস্ত্র হরণ করিলেন। তখন কহিলেন, "এখন নির্বিঘ্নে গৃহে যাও।"

ওসমান আর একটি কথা না বলিয়া অশ্বারোহণে দ্রুত দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

রাজপুত্র অশ্বারোহণ করিয়া দেখিলেন, অশ্বের বল্‌গায় লতাদ্বারা একখানি লিপি বাঁধা রহিয়াছে। বল্‌গা হইতে পত্র মোচন করিয়া দেখিলেন যে, তাহার উপরিভাগে লেখা আছে—"এই পত্র দুই দিবস মধ্যে খুলিবেন না; যদি খুলেন, তবে ইহার উদ্দেশ্য বিফল হইবে।"

রাজপুত্র পত্র কবচমধ্যে রাখিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া শিবিরাভিমুখে চলিলেন।

শিবিরে উপনীত হইবার পরদিন দূত-হস্তে আয়েষার এক লিপি পাইলেন।—

"রাজকুমার,

আমি যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, সেজন্য মনে করিও না, আয়েষা অধীরা। কি জানি, আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে যদি ওসমান ক্লেশ পায়, এই জন্যই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই।

তোমাকে অসুখী দেখিয়াছিলাম। যদি কখন সুখী হও, আয়েষাকে সংবাদ দিও। ইচ্ছা না হয়, সংবাদ দিও না। যদি কখন অন্তঃকরণে ক্লেশ পাও, তবে আয়েষাকে কি স্মরণ করিবে?

আর একবারমাত্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, ইচ্ছা আছে। যদি তুমি এ প্রদেশে বিবাহ কর, তবে আমায় সংবাদ দিও; আমি তোমার বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া তোমার বিবাহ দিব।

জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করিবেন, আয়েষার কথা মনে করিয়া কখনও দুঃখিত হইও না।"

জগৎসিংহ শীঘ্রহস্তে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া দূতের হস্তে দিলেন।

"আয়েষা, তুমি রমণীরত্ন। জগতে মনঃপীড়াই বুঝি বিধাতার ইচ্ছা। তোমার পত্রে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। বাঁচিয়া থাকি, তবে এক বৎসর পরে ইহার উত্তর দিব।"

দূত এই প্রত্যুত্তর লইয়া আয়েষার নিকট প্রতিগমন করিল।

১৯

দুই দিবস পরে রাজপুত্র কৌতূহলী হইয়া অশ্ববল্গায় প্রাপ্ত লিপি খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে কেবল এইমাত্র লেখা আছে—

"যদি ধর্মভয় থাকে, যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে, তবে পত্র পাঠমাত্র এই স্থানে একা আসিবে। ইতি—

অহং ব্রাহ্মণঃ।"

রাজপুত্র লিপিপাঠে চমৎকৃত হইলেন। ক্ষণেক চিন্তার পর

যাওয়াই স্থির করিলেন। পূর্বকথিত ভগ্ন অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। পরে অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, একজন ব্রাহ্মণ অধোমুখে বসিয়া রোদন করিতেছেন। রাজপুত্র জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলেন, ইনি অভিরাম স্বামা। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে স্মরণ করিয়াছেন কি জন্য ? রোদনই বা কেন ?"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "যে কারণে রোদন করিতেছি, সেই কারণেই তোমাকে ডাকিয়াছি ; তিলোত্তমার মৃত্যুকাল উপস্থিত।"

ধীরে ধীরে জগৎসিংহ সেইখানে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। অভিরাম স্বামী বলিতে লাগিলেন—"যেদিন বিমলা কতলু খাঁকে বধ করিয়া বৈধব্যের প্রতিশোধ লইয়াছিল, সেইদিন অবধি আমি তাহাদিগকে লইয়া পাঠান-ভয়ে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম, সেইদিন অবধি তিলোত্তমার রোগের সঞ্চার। যে কারণে রোগের সঞ্চার, তাহা তুমি বিশেষ অবগত আছ।"

জগৎসিংহের হৃদয়ে শেল বিঁধিল।

"সে অবধি তাহাকে নানাস্থানে রাখিয়া নানামত চিকিৎসা করিয়াছি। কিন্তু যে রোগ হৃদয়মধ্যে চিকিৎসায় তাহার প্রতিকার নাই।—পূর্বাবধি অভিলাষ ছিল যে, তিলোত্তমাকে রক্ষা করিতে না পারিলে, তোমার সহিত আর একবার দেখা করাইয়া, অন্তিমকালে তাহার অন্তঃকরণকে তৃপ্ত করিব। সেই জন্যই তোমাকে আসিতে লিখিয়াছি।"

রাজপুত্র অভিরাম স্বামীর সঙ্গে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। দেখিলেন, একটি অভগ্ন কক্ষে ভগ্ন পালঙ্কোপরি তিলোত্তমা শয়ান রহিয়াছেন। বিধবা দীনা বিমলা নিকটে বসিয়া অঙ্গে হস্তমার্জন করিতেছেন।

রাজপুত্র আসিয়া তিলোত্তমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অভিরাম স্বামী

ডাকিয়া কহিলেন, "তিলোত্তমা, রাজকুমার জগৎসিংহ আসিয়াছেন।"

তিলোত্তমা জগৎসিংহের প্রতি চাহিলেন; দেখিতে দেখিতে লোচনে দরদর ধারা বহিতে লাগিল। রাজকুমার আর থাকিতে পারিলেন না; তিলোত্তমার পদপ্রান্তে বসিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

... ...

বিমলা ও জগৎসিংহের শুশ্রূষাগুণে তিলোত্তমা দিনে দিনে পুনর্জীবন পাইতে লাগিলেন ও ক্রমে সবল হইয়া উঠিলেন।...

একদিন প্রদোষকালে অভিরাম স্বামী কক্ষান্তরে বসিয়া পুথি পড়িতেছিলেন। রাজপুত্র তথায় গিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "মহাশয়, তিলোত্তমা এখন স্থানান্তর-গমনের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন; অতএব আর এ ভগ্নগৃহে কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি?—গড়-মান্দারণে চলুন। আর যদি আপনার অনভিমত না হয়, তবে তিলোত্তমাকে সম্প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

অভিরাম স্বামী পুথি ফেলিয়া উঠিয়া রাজপুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

বিমলা আর আশমানী রাজপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন। বাহিরে থাকিয়া সকল শুনিলেন। রাজপুত্র বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, বিমলার অকস্মাৎ পূর্বভাব প্রাপ্তি হইয়াছে; অনবরত হাসিতেছেন, আর আশমানীর চুল ছিঁড়িতেছেন ও তাহাকে কিল মারিতেছেন; আশমানী মারপিট তৃণজ্ঞান করিয়া বিমলার নিকট নৃত্যের পরীক্ষা দিতেছে। রাজপুত্র এক পাশ দিয়া সরিয়া গেলেন।

২০

অভিরাম স্বামী গড়-মান্দারণে গমন করিয়া মহাসমারোহের সহিত তিলোত্তমাকে জগৎসিংহের হস্তে সম্প্রদান করিলেন।

উৎসবে জগৎসিংহ নিজ সহচরবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। তিলোত্তমার পিতৃ-বন্ধুও অনেকে আনন্দকার্যে আসিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিলেন। জগৎসিংহ আয়েষাকেও সংবাদ দিয়াছিলেন। আয়েষা নিজ কিশোরবয়স্ক সহোদরকে সঙ্গে লইয়া এবং আর আর পৌরবর্গে বেষ্টিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

বিবাহের পর আয়েষা হাসিয়া বিমলার নিকট বিদায় লইলেন। পরে তিনি তিলোত্তমাকে ডাকিয়া এক নিভৃত কক্ষে আনিলেন। তিলোত্তমার করধারণ করিয়া কহিলেন, "ভগিনী, আমি চলিলাম। কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি, তুমি অক্ষয় সুখে কালযাপন কর।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "আবার কতদিনে আপনার সাক্ষাৎ পাইব?"

আয়েষা কহিলেন, "সাক্ষাৎ হউক বা না হউক, তুমি আয়েষাকে বিস্মৃত হইও না—স্মরণার্থ যে চিহ্ন দিই, তাহা ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া আয়েষা গজদন্তনির্মিত পাত্রমধ্য হইতে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার বাহির করিয়া তিলোত্তমার অঙ্গে পরাইতে লাগিলেন। তিনি পিতৃদত্ত নিজ অলঙ্কাররাশি নষ্ট করিয়া তিলোত্তমার জন্য এই সকল রত্নভূষা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিলোত্তমা সে-সকলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আয়েষা কহিলেন, "ভগিনী, এ-সকলের প্রশংসা করিও না। তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ-সকল তাঁহার চরণরেণুর তুল্য নহে।"

তিলোত্তমা দেখিলেন, আয়েষার নয়নপল্লব জলভারস্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতেছে। তিলোত্তমা সমদুঃখিনীর ন্যায় কহিলেন, "কাঁদিতেছ কেন?" অমনি আয়েষার নয়নবারিস্রোত দরদরিত হইয়া বহিতে লাগিল।

আয়েষা আর তিলার্ধ অপেক্ষা না করিয়া, দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া দোলারোহণ করিলেন।

কপালকুণ্ডলা

১

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। ঘোর কুজ্ঝটিকায় দিগ্‌ভ্রম হওয়ায় নাবিকেরা অত্যন্ত ভয়কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। আরোহীরা প্রথমে এ-সকল কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে যখন অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, তখন নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল।

নৌকারোহিগণের মধ্যে একজন যুবাপুরুষ ছিলেন। তিনি জানিতেন, তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে। কিন্তু সমুদ্র দেখিবেন বলিয়া তাঁহার বড় সাধ ছিল; সেইজন্যই তিনি আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম নবকুমার। তিনি কোন মতে যাত্রী-দিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, "তোমরা এখন বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যেখানে যায় যাক; পরে রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"—নাবিকেরা তাহাই করিল।

বেলা প্রায় এক প্রহর হইলে রৌদ্র উঠিল। যাত্রীরা দেখিলেন, নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্তী। নাবিকেরা নৌকা তীরলগ্ন করিলে, তাঁহারা অবতরণ করিয়া স্নানাদি সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু নৌকায় কাষ্ঠ নাই বলিয়া পাকের উদ্‌যোগে বাধা উপস্থিত হইল। ব্যাঘ্র-ভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠারহস্তে কাষ্ঠ আহরণে চলিলেন। সম্মুখে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ না থাকায় তাঁহাকে নদীতীর হইতে অধিক দূরে গমন করিতে হইল। সেজন্য নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হওয়ায় সকলের এইরূপ

আশঙ্কা হইল যে, তাঁহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। ইত্যবসরে জোয়ার আসিল; নাবিকেরা বুঝিল, নৌকা তীরে থাকিলে তরঙ্গের আঘাতে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদীমধ্যবর্তী হইতে লাগিল—নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশীমাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহে,—সুতরাং অনেক দূর আসিবার পর যখন জলের বেগ কমিয়া আসিল, তখন ক্লেশস্বীকার করিয়া নবকুমারের জন্য প্রতিগমন করিতে কেহই সম্মত হইলেন না। নৌকা আর ফিরিল না।

২

কাষ্ঠভার লইয়া নবকুমার নদীতীরে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথমে নৌকা না দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু পরে বিবেচনা করিলেন, জলোচ্ছ্বাসের জন্য সহযাত্রীরা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানে নৌকা রক্ষা করিয়াছেন, শীঘ্র তাঁহাকে সন্ধান করিয়া লইবেন। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু নৌকা আসিল না, নৌকারোহীও কেহ দেখা দিল না। নবকুমার ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইলেন। আর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া নৌকার সন্ধানে নদীর তীরে তীরে ফিরিতে লাগিলেন। কোথাও নৌকার সন্ধান পাইলেন না। ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল; সূর্যাস্ত হইল। তখন তাঁহার ধারণা হইল যে, হয় জলোচ্ছ্বাসে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নতুবা সঙ্গিগণ তাঁহাকে এই বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

নবকুমার দেখিলেন যে, গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য নাই, পেয় নাই। নদীর জল অসহ্য লবণাক্ত; অথচ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। দুরন্ত শীতনিবারণজন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্যন্ত নাই। নদীতীরে নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে

হইবে। হয়তো ব্যাঘ্র-ভল্লুকে প্রাণনাশ করিবে। মনের চাঞ্চল্যহেতু তিনি ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার শ্রম জন্মিল। সমস্ত দিন অনাহার; এজন্য অধিক অবসন্ন হইলেন। একস্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন।

যখন নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন গভীর রজনী। অকস্মাৎ সম্মুখে বহুদূরে একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। নবকুমার গাত্রোত্থান করিয়া সেই আলোকের দিকে চলিলেন। আলোকের নিকটে আসিয়া যাহা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিনি দেখিলেন যে, ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালাধারী, আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটাপরিবেষ্টিত এক ভীষণ-দর্শন কাপালিক এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কাপালিক গাত্রোত্থান করিলে, তাঁহার নির্দেশানুসারে নবকুমার কাপালিকের অনুগামী হইলেন। পরিশেষে এক পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইয়া কাপালিক নবকুমারকে কিছু ফলমূল ও জল প্রদান করিলেন এবং সেখানে নির্বিঘ্নে থাকিতে পারিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিলেন। নবকুমার সেই সামান্য ফলমূল আহার করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পরে একখণ্ড ব্যাঘ্রচর্মে শয়ন করিয়া শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

৩

প্রাতে উঠিয়া নবকুমার বাটীগমনের উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু পথহীন বনমধ্য হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইবেন? কি প্রকারেই বা পথ চিনিয়া বাটী যাইবেন? কাপালিক অবশ্য পথ জানেন; জিজ্ঞাসা করিলে কি পথ বলিয়া দিবেন না? ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নবকুমার

কাপালিকের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তথাপি কাপালিক প্রত্যাগমন করিলেন না। অল্প বেলা থাকিতে ক্ষুধার পীড়নে নবকুমার ফল অন্বেষণে বাহির হইলেন এবং বাদামের ন্যায় অতি সুস্বাদু এক প্রকার ফলের দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিলেন।

নবকুমার অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। তাঁহার পথভ্রান্তি ঘটিল। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র সম্মুখে দেখিয়া আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। নবকুমার তীরে বসিয়া একমনে সাগরের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে একেবারে সন্ধ্যাতিমির আসিয়া কালো জলের উপর বসিলে তাঁহার চেতনা হইল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন—সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি। তাঁহার বাক্‌শক্তি রোধ হইল—তিনি স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দহীন। অনেকক্ষণ পরে তরুণী অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" নবকুমার নিরুত্তর—নিস্পন্দ। রমণী কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "আইস।"—এই বলিয়া তরুণী চলিলেন; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিছু দূর যাইয়া দেখেন যে, সম্মুখে কুটীর। কিন্তু সে সুন্দরীকে আর দেখিতে পাইলেন না।

৪

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই নবকুমার সমুদ্রতীরের দিকে চলিলেন। তথায় পূর্বদৃষ্টা তরুণীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—সে-স্থান তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অনেক বেলাতেও সেখানে

কেহ আসিল না। তখন নবকুমার সে-স্থানের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু মনুষ্যের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সেইস্থানে উপবেশন করিলেন। সূর্য অস্তগত হইল; অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল; নবকুমার হতাশ হইয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, কাপালিক কুটীরমধ্যে ধরাতলে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে আছেন। নবকুমার তাঁহার নিকট গৃহগমনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। "আমার সঙ্গে আইস"—এই বলিয়া কাপালিক গাত্রোত্থান করিলেন এবং অগ্রে অগ্রে চলিলেন। নবকুমার তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন।

অকস্মাৎ নবকুমারের পৃষ্ঠদেশে কাহার কোমল করস্পর্শ হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, সেই তরুণী বনদেবী মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া কথা বলিতে নিষেধ করিতেছেন। কাপালিক এ-সকল কিছুই দেখিতে পাইলেন না, অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেলেন। তখন রমণী মৃদুস্বরে কহিলেন, "কোথা যাইতেছ? যাইও না। ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।" এই কথা বলিয়াই তরুণী সরিয়া গেলেন। নবকুমার অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কাপালিক তাঁহাকে সঙ্গে না দেখিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার পুনরাহ্বানে বিনা বাক্যব্যয়ে নবকুমার তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন।

কিছু দূর গমন করিয়াছেন, এমন সময় তীরের ন্যায় বেগে পূর্বদৃষ্টা রমণী তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন। গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেলেন, "এখনও পলাও। নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?" যুবতীর এই কথা কাপালিকের কর্ণে গেল। তিনি কহিলেন, "কপালকুণ্ডলে!" কিন্তু কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিলেন না।

কাপালিক নবকুমারের হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। পূজার স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি কতকগুলি শুষ্ক কঠিন লতার দ্বারা

নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। নবকুমারের সাধ্যমত বলপ্রকাশেও কিছুমাত্র ফল হইল না। তারপর কাপালিক পূজাদি ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইলেন।

মৃত্যু আসন্ন, নবকুমার ইষ্টদেবচরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন। একবার জন্মভূমি মনে পড়িল, নিজ সুখের আলয় মনে পড়িল, একবার বহুদিন অন্তর্হিত জনক-জননীর মুখ মনে পড়িল, দুই-এক বিন্দু অশ্রুজল বালুকায় পড়িয়া শুষিয়া গেল। পূজাশেষে কাপালিক খড়্গ লইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। কিন্তু যেখানে খড়্গ রাখিয়াছিলেন, সেখানে খড়্গ পাইলেন না। কাপালিক কিছু বিস্মিত হইলেন। ইতস্তত অনুসন্ধান করিয়াও খড়্গ পাইলেন না। কপালকুণ্ডলাকে বারবার ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তখন দ্রুতপদে কুটীরের দিকে চলিলেন।

এমন সময় নিকটে অতি কোমল পদধ্বনি হইল। নবকুমার নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, কপালকুণ্ডলা। তাঁহার করে খড়্গ দুলিতেছে। কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "চুপ! কথা কহিও না—খড়্গ আমারই কাছে—চুরি করিয়া রাখিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি অতি ক্ষিপ্রহস্তে নবকুমারের লতাবন্ধন ছেদন করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। কহিলেন, "পলায়ন কর; আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা তীরবেগে পথ দেখাইয়া চলিলেন। নবকুমার তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

এদিকে কাপালিক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া, না খড়্গ না কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইয়া, সন্দিগ্ধচিত্তে পূজার স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন ছিন্ন লতাবন্ধনের উপর দৃষ্টি পড়ায় সকল বুঝিতে পারিলেন এবং চারদিক ভালরূপ দর্শনের জন্য এক উচ্চ বালিয়াড়ির শিখরে উঠিলেন। কাপালিক এক পার্শ্ব দিয়া উঠিলেন; তাহার অপর

পার্শ্ব বর্ষার জলপ্রবাহে ক্ষয়িত হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন না। কাপালিকের শরীরভরে সেই স্তূপশিখর ভগ্ন হইয়া অতি ঘোর রবে ভূপতিত হইল। কাপালিকও তাহার সহিত পড়িয়া গেলেন।

৫

কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় এক দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন। দেবালয়ের অধিকারী কপালকুণ্ডলার পরিচিত। পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত করাতে তিনি দ্বার খুলিয়া দিলেন। কপালকুণ্ডলা দুই-চারি কথায় তাঁহাকে নিজ সঙ্গীর অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। অধিকারী নবকুমারকে কহিলেন, "আজি এখানে লুকাইয়া থাকুন, কালি প্রত্যুষে আপনাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।"

নবকুমার শয়ন করিলে, কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। অধিকারী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, "মা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না—গেলে তোমার রক্ষা নাই।—এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-সন্তান। এ যদি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়, তবে এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও।"

"বি—বা—হ!" এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, "বিবাহের নাম তো তোমাদের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না।—কি করিতে হইবে?"

অধিকারী কহিলেন, "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান; এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলে।"—অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলেন। বলিলেন, "তবে তাহাই হউক।"

অধিকারী নবকুমারের নিকটে গিয়া কহিলেন, "এই কন্যা

আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। ইনি সেই কাপালিকের কুটীরে ফিরিয়া গেলে বা এখানে থাকিলে, আপনার যে-দশা ঘটিতেছিল ইঁহার সেই দশা ঘটিবে। ইনি ব্রাহ্মণকন্যা; ইঁহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খৃষ্টীয়ানগণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়া যানভঙ্গ হওয়ায় তাহাদের দ্বারা এই সমুদ্রতীরে পরিত্যক্তা হন। কাপালিক ইঁহাকে পাইয়া প্রতিপালন করিয়াছেন। ইঁহার চরিত্র পরম পবিত্র। আপনি ইঁহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব।”—নবকুমার ইহাতে সম্মত হইলেন।

ইতিপূর্বে একবার বিবাহ করিলেও প্রকৃতপক্ষে নবকুমারের এক ‘সংসার’ও ছিল না। বিবাহের পর তাঁহার পত্নী পদ্মাবতী কিছু দিন পিত্রালয়ে রহিলেন; মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা সপরিবারে পাঠানদিগের হস্তে পতিত হইয়া অবরুদ্ধ হইলেন এবং মুসলমান হইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। আর নবকুমারের সহিত তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল না। তারপর নবকুমার আর বিবাহ করেন নাই।

পরদিন গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিকপালিতা সন্ন্যাসিনী কপালকুণ্ডলার বিবাহ হইল। তৎপর দিন প্রত্যুষে তিনজনে যাত্রা করিলেন। অধিকারী কপালকুণ্ডলার অঞ্চলে কিঞ্চিৎ অর্থ বাঁধিয়া দিলেন। অনেক বেলা হইলে তাঁহারা মেদিনীপুরের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অধিকারী কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন। কপালকুণ্ডলাও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন।

নবকুমার মেদিনীপুরে আসিয়া অধিকারীর প্রদত্ত অর্থে কপালকুণ্ডলার জন্য একজন দাসী, একজন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে

শিবিকারোহণে পাঠাইলেন। অর্থের অপ্রাচুর্য হেতু স্বয়ং পদব্রজে চলিলেন। বাহকেরা তাঁহাকে অনেক পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। কপালকুণ্ডলার সহিত সম্মুখস্থ চটিতে একত্র হইবার জন্য নবকুমার দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন।

কিছু দূর যাইয়া নবকুমার দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক একখানি শিবিকাতে বন্ধনযুক্ত অবস্থায় রহিয়াছেন। রমণী কহিলেন, "দস্যুতে আমার পাল্কী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; বাহকেরা ও অন্যান্য সকলে পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার অঙ্গের অলঙ্কারসকল লইয়া আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।" নবকুমার তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া কহিলেন, "তুমি উঠিতে পারিবে কি?" স্ত্রীলোক কহিলেন, "আমাকেও এক ঘা লাঠি লাগিয়াছিল; এজন্য পায়ে অত্যন্ত বেদনা; কিন্তু বোধ হয়, অল্প সাহায্য করিলেই উঠিতে পারিব।" নবকুমার হাত বাড়াইয়া দিলেন। রমণী তাহার সাহায্যে গাত্রোত্থান করিলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "চলিতে পারিবে কি?" স্ত্রীলোক কহিলেন, "বোধ হয়, কোন কিছুর উপর ভর করিতে পারিলে চলিতে পারিব।" নবকুমার কহিলেন, "আমার কাঁধে ভর করিয়া চল।" স্ত্রীলোকটি নবকুমারের স্কন্ধে ভর করিয়া চলিলেন। অনতিবিলম্বে নবকুমার সেই রমণীকে লইয়া চটিতে উপস্থিত হইলেন।

নবকুমার দেখিলেন যে, ঐ চটিতেই কপালকুণ্ডলা অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার দাসদাসী তজ্জন্য একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়াছিল। নবকুমার স্বীয় সঙ্গিনীর জন্য তৎপার্শ্ববর্তী একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তখন নবকুমার দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গিনী অসামান্যা সুন্দরী।

এই সুন্দরী নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী—পদ্মাবতী। বহুদিন পরে স্বামীস্ত্রীতে সাক্ষাৎ—সুতরাং পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন না।

পদ্মাবতী, নিজ নাম মতিবিবি এবং তিনি পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানী —নবকুমারকে আপনার এইরূপ পরিচয় দিলেন। পরে নবকুমারের পরিচয়ে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি-ই তাঁহার স্বামী। নবকুমার বিদায় লইয়া কপালকুণ্ডলার নিকটে গমন করিলেন।

ক্ষণেক পরে মতিবিবির লোকজন, দাসদাসী ও বাহক সিন্দুক ইত্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল। একখানি শিবিকাও আসিল; তাহাতে একজন দাসী, নাম পেষমন্। মতিবিবি কারুকার্যযুক্ত বেশভূষা ও বিচিত্র অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া নবকুমারের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। নবকুমার আসিলে মতিবিবি কহিলেন, "মহাশয়, চলুন, আপনার পত্নীর নিকট পরিচিত হইয়া আসি।" নবকুমার মতিবিবিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন—পেষমন্ও সঙ্গে চলিল।

কপালকুণ্ডলা একাকিনী বসিয়া ছিলেন। মতি অনিমেষলোচনে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহেন না—মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা। ক্ষণেক পরে মতি আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মোচন করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না। নবকুমার আপত্তি করিলে মতি কহিলেন, "ইহাকে পরাইয়া আমার যদি সুখবোধ হয়, আপনি কেন বাধা দেন?"

মতিবিবি ইহা কহিয়া দাসীসঙ্গে চলিয়া গেলেন। বিরলে আসিলে, পেষমন্ যখন নবকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, তখন মতিবিবি উত্তর করিলেন, "মেরা খসম।"

৭

পরদিন প্রভাতে মতিবিবি বর্ধমানাভিমুখে, নবকুমার সপ্তগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাহকেরা সহজেই নবকুমারকে পশ্চাতে ফেলিয়া

চলিল। কপালকুণ্ডলা শিবিকার দ্বার খুলিয়া চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন। একজন ভিক্ষুক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "আমার তো কিছুই নাই, তোমাকে কি দিব ?" ভিক্ষুক অলঙ্কারগুলির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। কপালকুণ্ডলা অকপটহৃদয়ে গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। ভিক্ষুক এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া গহনা লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, "ভিক্ষুক দৌড়িল কেন ?"...

সহযাত্রীরা প্রত্যাগমন করিয়া রটনা করিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদে তাঁহার বিধবা মাতা একেবারে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। এমন সময়ে যখন নবকুমার সস্ত্রীক বাটী আগমন করিলেন, তখন সকলের যারপরনাই আনন্দ হইল। নবকুমারের মাতা মহাসমাদরে বধূ বরণ করিয়া গৃহে লইলেন। নবকুমারের আনন্দের সীমা রহিল না।

৮

পূর্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। পরে সপ্তগ্রামের অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট ও বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল। এই সপ্তগ্রামের এক নির্জন ভাগে, একটি ইষ্টকনির্মিত দোতলা গৃহে নবকুমারের বাস। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। গৃহের ছাদে দাঁড়াইয়া নবকুমারের ভগিনী শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলা চতুর্দিক অবলোকন করিতেছিলেন। বাটীর সম্মুখে প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল, রূপার সূতার ন্যায় পড়িয়া আছে। বাটীর পশ্চাদ্ভাগে এক বিস্তৃত নিবিড় বন; তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। সম্মুখের খালটি একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। দূরে মহানগরীর

অসংখ্য সৌধমালা শোভা পাইতেছে। অন্যদিকে, অনেক দূরে নৌকা-ভরণা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে।

শ্যামাসুন্দরী ভ্রাতৃজায়াকে কখন 'বউ', কখন আদর করিয়া 'বন', কখন 'মৃনো' সম্বোধন করিতেছিলেন। কপালকুণ্ডলা নামটি বিকট বলিয়া গৃহস্থেরা তাঁহার নাম মৃন্ময়ী রাখিয়াছিলেন। এই জন্যই শ্যামাসুন্দরী বলিতেছিলেন, "মৃনো, তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকিবি? তোর এ চুলের রাশি কি বাঁধিবি না? বল্ দেখি শুনি, তোর কিসে সুখ হয়।" মৃন্ময়ী কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিতা হইলেন।

৯

যখন পিতা মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বন করিলেন, তখন পদ্মাবতীর নাম হইল লুৎফ-উন্নিসা। মতিবিবি তাঁহার প্রকৃত নাম নহে। ছদ্মবেশে দেশবিদেশ ভ্রমণকালে তিনি ঐ নাম গ্রহণ করিতেন। মুসলমান হইবার কিছুদিন পর তাঁহার পিতা সপরিবারে আগ্রায় আসিলেন এবং গুণগ্রাহী আকবর শাহের অনুগ্রহে শীঘ্রই উচ্চপদস্থ হইয়া আগ্রার প্রধান ওমরাহমধ্যে গণ্য হইলেন। এদিকে লুৎফ-উন্নিসা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সর্বপ্রকারে সুশিক্ষিতা এবং রাজধানীর রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র মহাদোষে কলুষিত হইল। শেষে কলঙ্ক রটিল। তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

তখন যুবরাজ সেলিম তাঁহাকে রাজপুতপতি মানসিংহের ভগিনী, স্বীয় প্রধানা মহিষীর প্রধানা সহচরী করিলেন। সেলিমের চিত্তে তাঁহার এরূপ প্রভুত্ব জন্মিল যে, লুৎফ-উন্নিসা উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরাণী

হইবেন, রাজপুরবাসী সকলেরই ইহা সম্ভব বোধ হইল। এরূপ আশার স্বপ্নে লুৎফ-উন্নিসা জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা মেহের-উন্নিসাকে দেখিয়া সেলিম তাঁহার নিকট চিত্ত বিক্রয় করিলেন। কিন্তু পিতার অমতের জন্য তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিলেন না। শের আফগান নামক একজন ওমরাহের সহিত মেহেরের বিবাহ হইল। সেলিম আপাতত নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। এদিকে সম্রাট আকবর শাহ পীড়িত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন লুৎফ-উন্নিসা আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য এক দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিলেন।

মানসিংহের ভগিনী সেলিমের প্রধানা মহিষীর পুত্র খস্রু। প্রধান রাজমন্ত্রী খাঁ আজিম খস্রুর শ্বশুর। বাল্যসখী মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফ-উন্নিসার যেরূপ হৃদয়শেল, বেগমেরও সেইরূপ। তখন খস্রুকে আকবরের সিংহাসনে স্থাপিত করিবার ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। রাজা মানসিংহকে এ-কার্যে ব্রতী করিবার ভার থাকিল বেগমের উপর। আজিম ও অন্যান্য মহম্মদীয় ওমরাহগণকে লিপ্ত করার ভার লইলেন লুৎফ-উন্নিসা। এই সম্পর্কে তিনি উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। তিনি যখন সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বর্ধমান অভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন পথে তাঁহার সহিত নবকুমারের সাক্ষাৎ।

১০

বর্ধমান পৌঁছিবার পূর্বেই লুৎফ-উন্নিসা খাঁ আজিমের পত্রে অবগত হইলেন যে, আকবর শাহের পরলোকে গতি হইয়াছে। মৃত্যুকালেও আকবর শাহ আপন বুদ্ধিবলে তাঁহাদিগের সকল যত্ন বিফল করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞাবলে কুমার সেলিম জাহাঁগীর শাহ হইয়াছেন।

সেলিমের মনোভাব লুৎফ-উন্নিসার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন, শীঘ্রই মেহের-উন্নিসার স্বামী শের আফগানের প্রাণান্ত হইবে—মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীর শাহের মহিষী হইবেন। কিন্তু মেহের-উন্নিসাকে লুৎফ-উন্নিসা ভালরূপ জানিতেন। যদি তিনি স্বামীর প্রতি যথার্থ স্নেহশালিনী হইয়া থাকেন, তবে জাহাঁগীর শত শের আফগান বধ করিলেও মেহের-উন্নিসাকে পাইবেন না। আর যদি তিনি জাহাঁগীরের যথার্থ অভিলাষিণী হন, তবে আর কোন ভরসা নাই। সুতরাং মেহের-উন্নিসার মন জানিবার জন্য মতিবিবি বর্ধমানে আসিয়া শের আফগানের আলয়ে উপনীত হইলেন।—এই সময়ে শের আফগান বর্ধমানের শাসনকর্তা হইয়া সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন।—শের আফগান সপরিবারে তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরে তথায় অবস্থিতি করাইলেন।

একদিন দুই সখী পরস্পরের মন জানিতে উৎসুক হইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মতি বুঝিলেন যে, মেহের জাহাঁগীরের যথার্থ অনুরাগিণী। ইহাতে মতির আশা-ভরসা সকলই নির্মূল হইল। কিন্তু তাহাতে তিনি যেন কিছু সুখই অনুভব করিলেন।

নবকুমারের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে তাঁহার প্রতি মতিবিবির অনুরাগ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। এইজন্যই লুৎফ-উন্নিসা জাহাঁগীরের প্রতি মেহের-উন্নিসার অনুরাগের বিষয় অবগত হইয়াও অসুখী হন নাই; এই জন্যই তিনি আগ্রায় আসিয়া জন্মের মত বাদশাহের নিকট বিদায় লইলেন।

১১

লুৎফ-উন্নিসা সপ্তগ্রামে আসিলেন। রাজপথের অনতিদূরে নগরীর মধ্যে এক অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন এই অট্টালিকার এক সুসজ্জিত কক্ষে লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে বসিয়া আছেন ; পৃথক্ আসনে নবকুমার বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া লুৎফ-উন্নিসা নবকুমারকে কহিলেন, "তুমি কি চাও ? ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়—সকলই দিব, কিছুই তাহার প্রতিদান চাই না ; কেবল তোমার দাসী হইতে চাই।"

নবকুমার কহিলেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার ধনসম্পদে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি আবার আগ্রায় ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।"

লুৎফ-উন্নিসা তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে কহিলেন, "এ-জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না। তুমি আমারই হইবে।"

সংশয়াধীন হইয়া নবকুমার সঙ্কুচিত-স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি কে ?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আমি পদ্মাবতী।"

উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া লুৎফ-উন্নিসা স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। নবকুমারও অন্যমনে কিছু শঙ্কান্বিত হইয়া আপন আলয়ে গেলেন।

১২

তারপর দুই দিন অতীত হইল। এই দুই দিনে লুৎফ-উন্নিসা নিজ কর্তব্য স্থির করিলেন।

সূর্য অস্তাচলগামী। লুৎফ-উন্নিসা পুরুষবেশে সজ্জিত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং নবকুমারের বাটীর দিকে চলিলেন। নবকুমারের বাটীর অনতিদূরস্থ নিবিড় বনের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তখন রাত্রি হইয়া আসিয়াছে।

ঘটনাক্রমে তাঁহার এক সহায় উপস্থিত হইল। তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে বনমধ্যে একটি আলো দেখিতে পাইলেন।

অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, সে হোমের আলো—এক ব্যক্তি মন্ত্রপাঠ-পূর্বক হোম করিতেছে। মন্ত্রমধ্যে একটি শব্দ বুঝিতে পারিলেন, সে একটি নাম। নামটি শুনিবামাত্র লুৎফ-উন্নিসা হোমকারীর নিকটে গিয়া বসিলেন।

১৩

নবকুমারের ভগিনী শ্যামাসুন্দরী কুলীনপত্নী। কয়েক দিন হইল তাঁহার কুলীন স্বামীর শুভাগমন হইয়াছে। কালি বিকালে চলিয়া যাইবেন। ঔষধ প্রয়োগ করিয়া শ্যামা তাঁহাকে বশ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। কালি রাত্রে শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলা ঔষধের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন; ঔষধ খুঁজিয়া পান নাই, কিন্তু বিলক্ষণ তিরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। আজি দিনে কপালকুণ্ডলা সে গাছ চিনিয়া, আর যে বনে হয় তাহাও দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি একা গিয়া ঔষধ তুলিয়া আনিব।"

শ্যামা। মন্দলোকে মন্দ বল্‌বে।

কপাল। বলুক না, আমি তাতে মন্দ হব না।

শ্যামা। কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী করিবে?

কপাল। ইহাতে তিনি অসুখী হন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কখনও বিবাহ করিতাম না।

ইহার পর কপালকুণ্ডলা গৃহকার্য সমাধা করিয়া ঔষধের অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছিল। নিশা জ্যোৎস্নাময়ী। কপালকুণ্ডলা যে বাহিরে যাইতেছেন, তাহা নবকুমার গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন। তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া কপালকুণ্ডলার হাত ধরিলেন। কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে সকল

কথা বলিলে, তিনি তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। ইহাতে কপালকুণ্ডলা গর্বিতবচনে কহিলেন, "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কিনা স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।"—নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বিশ্বাস-সহকারে কপালকুণ্ডলার হাত ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কপাল-কুণ্ডলা একাকিনী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

১৪

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া কপালকুণ্ডলা দেখিলেন, নিবিড় বনমধ্যে আলো জ্বলিতেছে। পূর্ব অভ্যাসের ফলে তিনি এ-সকল সময়ে ভয়হীনা, অথচ কৌতূহলময়ী। ধীরে ধীরে সেই আলোর নিকটে যাইয়া দেখিলেন, সেখানে কেহ নাই। কিন্তু তাহার অনতিদূরে একটি ইষ্টকনির্মিত ভগ্নগৃহ হইতে মনুষ্য-কথোপকথন-শব্দ নির্গত হইতেছে। উত্তমরূপে শুনিবার জন্য কপালকুণ্ডলা কক্ষ-প্রাচীরের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার আগ্রহাতিশয় ও শঙ্কার কারণে ঘন ঘন গুরু শ্বাস বহিতে লাগিল। মনুষ্যশ্বাস শুনিতে পাইয়া গৃহমধ্যস্থ এক ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন এবং আসিয়াই কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইলেন। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন, আগন্তুক ব্রাহ্মণবেশী। ব্রাহ্মণবেশী তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কপালকুণ্ডলা, তুমি রাত্রে এ নিবিড় বনমধ্যে কি জন্য আসিয়াছ?"

এখন কপালকুণ্ডলা কতকদূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হইয়াছিলেন; সুতরাং অজ্ঞাত রাত্রিচর পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া অবাক্ হইলেন, কিছু ভীতাও হইলেন। সহসা কোন উত্তর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। ব্রাহ্মণবেশী তাঁহার হস্ত ধরিয়া ভগ্নগৃহ হইতে কিছু দূরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা অতি ক্রোধে হস্ত মুক্ত করিয়া লইলেন। তখন ব্রাহ্মণবেশী অতি মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলার কানের

কাছে কহিলেন, "চিন্তা কি? আমি পুরুষ নহি।" কপালকুণ্ডলা আরও চমৎকৃতা হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণবেশধারিণীর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ভগ্নগৃহ হইতে অদৃশ্য স্থানে গিয়া তিনি কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন, "আমরা যে কুপরামর্শ করিতেছিলাম, তাহা শুনিবে? সে তোমারই সম্বন্ধে।—তবে যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করি, ততক্ষণ এই স্থানে প্রতীক্ষা কর।"

এই বলিয়া ছদ্মবেশিনী ভগ্নগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; কপালকুণ্ডলা কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার কিছু ভয় জন্মিয়াছিল, আর বসিতে পারিলেন না—উঠিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তখন আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল; কাননতলে যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা শীঘ্র-পদে বনমধ্য হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন। আসিবার সময় যেন পশ্চাদ্ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। এমন সময়ে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা দৌড়িয়া গৃহে আসিলেন। প্রাঙ্গণ পার হইয়া প্রকোষ্ঠ-মধ্যে উঠিলেন। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাঙ্গণের দিকে সম্মুখ ফিরিলেন। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। দেখিলেন, প্রাঙ্গণে সাগরতীরবাসী সেই কাপালিক দাঁড়াইয়া আছেন।

১৫

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ধীরে ধীরে শয়নাগারে আসিলেন, ধীরে ধীরে পালঙ্কে শয়ন করিলেন। সে-রাত্রে নবকুমার মনের দুঃখে অন্তঃপুরে আসেন নাই। শয়নাগারে একাকিনী কপাল-

কুণ্ডলা শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। সকল ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে পূর্বদিকে উষার আলো দেখা দিল; তখন কপালকুণ্ডলার অল্প তন্দ্রা আসিল। যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে, গবাক্ষ উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহার উপর কতকগুলি মনোহর বন্য-লতা দুলিতেছে। কপালকুণ্ডলা নারীস্বভাববশতঃ লতাগুলি গুছাইয়া লইতে লাগিলেন। তাহার মধ্য হইতে একখানি লিপি বাহির হইল। তাহাতে পাঠ করিলেন—

"অদ্য সন্ধ্যার পর কল্য রাত্রের ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তোমার নিজের সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা শুনিতে পাইবে।—অহং ব্রাহ্মণবেশী।"

অনেক বিবেচনার পর কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। সন্ধ্যার পর গৃহকর্ম সমাপন করিয়া তিনি বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কেশবন্ধন-সময়ে লিপিখানি কবরীমধ্যে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এখন কবরী আলুলায়িত করিয়াও তাহা পাইলেন না। সে বিশাল কেশরাশি পুনরায় বন্ধন না করিয়াই চলিলেন।

১৬

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কপালকুণ্ডলা যখন গৃহকার্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, তখন লিপি কবরী হইতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে ভূতলে পড়িয়া গিয়াছিল। নবকুমার তাহা দেখিয়াছিলেন এবং দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা কার্যান্তরে গেলে, লিপি খুলিয়া বাহিরে গিয়া পাঠ করিলেন। সে লিপি পাঠ করিয়া নবকুমার প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলেন না; পরে সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং কপালকুণ্ডলা যখন সন্ধ্যার সময় বনাভিমুখে যাত্রা করিবেন, তখন গোপনে তাঁহার অনুসরণ করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন।

কপালকুণ্ডলা বহির্গত হইয়া কিছু দূর গেলে, নবকুমারও বহির্গত হইতেছিলেন; এমন সময়ে দেখিলেন, দ্বারদেশে সেই পূর্বপরিচিত জটাজূটধারী কাপালিক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

কাপালিক কহিলেন, "বৎস, আমি সকলই অবগত আছি। তুমি যাহা দেখিতে চাহ, দেখাইব; এখন আমার কথা শ্রবণ কর। কোন ভয় করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, "আর তোমাকে আমার কোন ভয় নাই, আইস।"—এই বলিয়া নবকুমার কাপালিককে গৃহের ভিতরে লইয়া গিয়া আসন দিলেন এবং নিজেও উপবেশন করিলেন।

কাপালিক আসন গ্রহণ করিয়া দুই বাহু নবকুমারকে দেখাইলেন। নবকুমার দেখিলেন, উভয় বাহু ভগ্ন।—নবকুমারের সমুদ্রতীর হইতে পলায়নের রাত্রে বালিয়াড়ির শিখর হইতে পড়িয়া গিয়া কাপালিকের হস্ত দুইটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এখন বাহুদ্বয়ে শিশুর বলও নাই।

কাপালিক কহিলেন, "বৎস, কপালকুণ্ডলা বধযোগ্যা—আমি ভবানীর আজ্ঞাক্রমে তাহাকে বধ করিব। সে তোমার নিকটও বিশ্বাস-ঘাতিনী—তোমারও বধযোগ্যা; অতএব তুমি আমাকে সাহায্য প্রদান কর। এই অবিশ্বাসিনীকে ধরিয়া আমার সহিত যজ্ঞস্থানে লইয়া চল। তথায় স্বহস্তে ইহাকে বলিদান কর।—এই পবিত্র কর্মে তোমার অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হইবে, বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড হইবে, প্রতিশোধের চরম হইবে। এখন যাহা দেখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা দেখিবে চল।"

নবকুমার ঘর্মাক্তকলেবরে কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

১৭

বনমধ্যে ব্রাহ্মণবেশী লুৎফ-উন্নিসার সহিত কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ হইল। লুৎফ-উন্নিসা তাঁহাকে আনুপূর্বিক আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন,

"তোমার মৃত্যুই কাপালিকের অভীষ্ট। কিন্তু বালিয়াড়ির শিখর হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার হস্তদ্বয় ভগ্ন হওয়ায় সে এখন স্বীয় অভীষ্টসাধনে অক্ষম। আমাকে ব্রাহ্মণতনয় মনে করিয়া সে আমার সাহায্যে তোমাকে নিধন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। আমি তোমার প্রাণদান দিতেছি। তুমিও আমার প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর।"

কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। পরে কহিলেন, "স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?"

লু। বিদেশে—বহুদূরে। তোমাকে অট্টালিকা দিব—ধন দিব—দাসদাসী দিব—রাণীর ন্যায় থাকিবে।

কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না; তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন, "তোমার বাসনা পূর্ণ হউক। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

লুৎফ-উন্নিসা ও কপালকুণ্ডলা এরূপ একমনে কথাবার্তা কহিতেছিলেন যে, দুর হইতে কাপালিক ও নবকুমার যে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহা কিছুই দেখিতে পান নাই। নবকুমার ও কাপালিক ইঁহাদের দেখিতে পাইতেছিলেন মাত্র, কিন্তু ততদূর হইতে কথোপ-কথনের কিছুই শুনিতে পান নাই। কপালকুণ্ডলাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া নবকুমার ধীরে ধীরে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। কাপালিক ইহা দেখিয়া তাঁহাকে স্বহস্ত-প্রস্তুত তীব্র সুরা পান করাইলেন। তাহা পান করিবামাত্র নবকুমার সবল হইলেন।

এদিকে লুৎফ-উন্নিসা আপন অঙ্গুলি হইতে একটি বহুমূল্য অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া কপালকুণ্ডলার হস্তে দিয়া কহিলেন, "এই অঙ্গুরীয়টি

তুমি রাখ। ইহার পর অঙ্গুরীয় দেখিয়া ভগিনীকে মনে করিও।” নবকুমার এই অঙ্গুরীয়-প্রদানও দেখিতে পাইলেন।

কপালকুণ্ডলা লুৎফ-উন্নিসার নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। নবকুমার ও কাপালিক অদৃশ্য পথে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

১৮

কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে গৃহের দিকে চলিলেন। তাহার কারণ, তিনি অতি গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া যাইতেছিলেন। কপালকুণ্ডলার ধীরপদক্ষেপে অসহিষ্ণু হইয়া নবকুমার ভীমনাদে ডাকিলেন, “কপাল-কুণ্ডলা!” কপালকুণ্ডলা শুনিয়া চমকিত হইলেন। তিনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন; নবকুমার ও কাপালিক তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। নবকুমার দৃঢ়মুষ্টিতে কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিলেন। কাপালিক কহিলেন, “বৎসে, আমাদের সঙ্গে আইস।” এই বলিয়া কাপালিক শ্মশানাভিমুখে পথ দেখাইয়া চলিলেন। কপালকুণ্ডলা বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন। নবকুমার পূর্ববৎ দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া চলিলেন।

কাপালিক যেখানে আপন পূজাস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানে কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গেলেন। সে গঙ্গাতীরে এক বৃহৎ সৈকত-ভূমি—শ্মশানক্ষেত্র। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করাইয়া পূজা আরম্ভ করিলেন। উপযুক্ত সময়ে কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আনিবার জন্য নবকুমারের প্রতি আদেশ করিলেন। নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন, নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে; কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক, নিষ্কম্প। কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভয়

পাইতেছ ?" নবকুমারের মদিরার মোহ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতে-ছিল। অতি গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "ভয়ে মৃন্ময়ী ? তাহা নহে।" কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কাঁপিতেছ কেন ?" নবকুমার কহিলেন, "ভয়ে নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।" কপালকুণ্ডলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদিবে কেন ?" নবকুমার কহিলেন, "কাঁদিব কেন ? তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ী ? তুমি তো কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।" এই বলিয়া সহসা নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।—"মৃন্ময়ী ! কপালকুণ্ডলা ! আমায় রক্ষা কর। একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—আমি তোমায় গৃহে লইয়া যাই।"

কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদুস্বরে কহিলেন, "তুমি তো জিজ্ঞাসা কর নাই !"

যখন এই কথা হইল, তখন উভয়ে একেবারে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; কপালকুণ্ডলা অগ্রে, নদীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া ছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে এক পদ পরেই জল। এখন জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল।

নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, "বল—মৃন্ময়ী ! বল—বল—বল—আমায় রাখ।—গৃহে চল।"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "আজ যাহাকে দেখিয়াছ—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।"

"না—মৃন্ময়ী !—না !"—এইরূপ উচ্চ শব্দ করিয়া নবকুমার কপাল-কুণ্ডলাকে ধরিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর পাইলেন না। এক

বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যেখানে কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, সেখানে প্রহত হইল; অমনি সেই মৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোররবে নদী-প্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল।

নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।

রাজমোহনের বৌ

১

মধুমতী তীরে রাধাগঞ্জ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। প্রভূত ধনশালী জমিদার-গণের বাসস্থান বলিয়া গ্রামটি একটি গণ্ডগ্রামরূপে গণ্য হইয়া থাকে। একদা চৈত্রের অপরাহ্ণে ত্রিশ বৎসর বয়স্কা একটি রমণী এই গ্রামের একটি সামান্য পর্ণকুটীরে মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা সমাপন করিয়া বেশভূষায় ব্যাপৃতা হইল। রমণী শ্যামবর্ণা। মুখকান্তি নিতান্ত সুন্দর না হইলেও তন্মধ্যে ঈষৎ চঞ্চল মাধুরী ছিল, এবং নয়নের হাসিহাসিভাবে সেই মাধুরী আরও মধুর হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রসাধনে তাহার কালবিলম্ব হইল না। পরিশেষে তাম্বুলরাগে অধর রঞ্জিত করিয়া সে কলসীকক্ষে বাটী হইতে বাহির হইল এবং একজন প্রতিবেশীর গৃহের বাঁশের ঝাঁপ সবলে উদ্ঘাটিত করিয়া বরাবর অন্তঃপুরাভিমুখে চলিল। তথন সেখানে এক অষ্টাদশ বর্ষীয়া, গৌরবর্ণা, সর্বাঙ্গসুন্দরী তরুণী বস্ত্রের উপর কারুকার্য করিতেছিল। অভ্যাগতা তরুণীর নিকট মাটিতে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিতেছিস্ লো ?"

তরুণী হাসিয়া উত্তর করিল, "আজ যে দিদি, বড় অনুগ্রহ; না জানি আজ কাব মুখ দেখে উঠেছিলাম।"

অভ্যাগতা হাসিয়া কহিল, "আর কার মুখ দেখে উঠবে ? রোজ যার মুখ দেখে উঠ, আজও তার মুখ দেখে উঠেছ।"

এই কথা শুনিয়া তরুণীর মুখমণ্ডল ক্ষণেকের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইল। পরে সে হাতের সূচিকর্ম একপার্শ্বে রাখিয়া অভ্যাগতার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল। অভ্যাগতা নিজ গৃহ-যন্ত্রণার কথা সবিস্তারে বলিতে আরম্ভ করিল—কিন্তু সে-সকলের অধিকাংশই প্রায় কাল্পনিক। বলিতে বলিতে সে নিজ বস্ত্রাঞ্চলের অগ্রভাগ লইয়া পুনঃ পুনঃ চক্ষে

দিতে লাগিল—প্রতিবারই চক্ষু দুইটি কামধেনুর মত অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। শেষে হঠাৎ সূর্যদেবকে অস্তাচলে যাইতে উদ্যোগী দেখিয়া অত্যাগতা তরুণীকে জল আনিতে যাইবার আমন্ত্রণ করিল। এই আমন্ত্রণের জন্যই এতদূর আসা। নবীনা বারি-আনয়নে যাইতে অস্বীকৃতা হইল; কিন্তু তাঁহার সঙ্গিনী বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। নবীনা কহিল, "মধুমতীতে বড় কুমীর, গেলে কুমীরে খাবে।"

ইহা শুনিয়া সঙ্গিনী উচ্চ-স্বরে হাসিয়া উঠিল—নবীনা বুঝিল, তাহার আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। তখন সে কিছু গম্ভীর হইয়া বলিল, "তুই জানিস তো কনকদিদি, আমি কখন জল আনতে যাই না।"

কনক কহিল, "সেই জন্যই তো যাইতে বলি, তুই কেন সারাদিন পিঁজরেতে কয়েদ থাকবি? আর বাড়ীর বৌমানুষে জল আনে না?"

নবীনা সগর্বে উত্তর করিল, "জল আনা দাসীর কাজ।"

কনক। কেন, কে জল এনে দেয় লো? দাসী-চাকর কোথা?

নবীনা। ঠাকুরঝি জল আনে।

কনক। ঠাকুরঝি যদি দাসীর কাজ করতে পারে, তবে বৌ পারে না?

তখন তরুণী দৃঢ়স্বরে কহিল, "কথায় কাজ নাই কনক! তুমি জান, আমার স্বামী আমাকে জল আনতে বারণ করেছেন। তুমি তাঁকে চেন তো?"

কিন্তু কনক নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত তাহার পীড়াপীড়িতে তরুণী সম্মত হইয়া বলিল, "চল যাই, কিন্তু এতে পাপ হবে না তো?"

কনক হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমি ভুঁড়ে ভট্‌চাজ নই, শাস্ত্রের খবরও রাখি না।"

তরুণী চঞ্চলপদে পাকশালা হইতে একটি ক্ষুদ্র কলসী আনিল। তখন উভয়ে নদীর দিকে চলিল।

২

সূর্যের শেষকর অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু তখনও রাত্রি হয় নাই। এমন সময় কনক ও তাহার সঙ্গিনী কলসীকক্ষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। পথিপার্শ্বে একটি সুশোভন ক্ষুদ্র উদ্যান। উদ্যানমধ্যে একটি পুষ্করিণী। তাহার তীর কোমল তৃণে শোভিত; একদিকে ইষ্টকনির্মিত সোপানাবলী। ঘাটের সম্মুখে বৈঠকখানা। বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া দুই ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছিলেন।

বয়োধিক ব্যক্তির বয়স ত্রিশ বৎসরের উপর হইবে; দীর্ঘ শরীর, শ্যামবর্ণ, স্থূলাকার পুরুষ। কটিদেশে ঢাকাই ধুতি। ঢাকাই মলমলের পিরান গায়ে। পিরানে সোনার বোতাম; প্রায় সকল আঙ্গুলেই অঙ্গুরীয়; হস্তে যমদণ্ডতুল্য পিচের লাঠি। বামনদেবের পাদপদ্মতুল্য দুইখানি পায়ে ইংরেজী জুতা।

ইঁহার সঙ্গী পরম সুন্দর, বয়স অনুমান বাইশ বৎসর। তাঁহার সুবিমল স্নিগ্ধ বর্ণ। তাঁহার পরিচ্ছদ অনতিমূল্যবান—একখানি ধুতি, অতি পরিপাটী একখানি চাদর, একটি কেম্ব্রিকের পিরান; আর গোরার বাটীর জুতা পায়। একটি আঙ্গুলে একটি আংটি।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অপরকে কহিলেন, "তবে মাধব, তুমি আবার কলকাতা ধরেছ! আবার এ রোগ কেন?"

মাধব উত্তর করিলেন, "রোগ কিসে? মথুরদাদা, আমার কলকাতার উপর টান যদি রোগ হয়, তবে তোমার রাধাগঞ্জের উপর টানও রোগ।"

মথুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে?"

মাধব। নয় কিসে? তুমি রাধাগঞ্জের আম-বাগানের ছায়ায় বয়স কাটিয়েছ, তাই তুমি রাধাগঞ্জ ভালবাস; আমি কলকাতার দুর্গন্ধে কাল কাটিয়েছি, আমিও তাই কলকাতা ভালবাসি।

মথুর। শুধু দুর্গন্ধ! ড্রেনের শুকো দই; তাতে দুটা-একটা পচা ইঁদুর, পচা বেড়াল উপকরণ—দেবদুর্লভ।

মাধব হাসিয়া কহিলেন, "শুধু এ-সকল সুখের জন্য কলকাতায় যাচ্ছি না, আমার কাজও আছে।"

মথুর। কাজ তো সব জানি। কাজের মধ্যে নূতন ঘোড়া নূতন গাড়ি—ঠক বেটাদের দোকানে টো টো করা—টাকা উড়ান। হাঁ ক'রে ওদিকে কি দেখছ? তুমি কি কখন কন্‌কিকে দেখ নি? না ওই সঙ্গের ছুঁড়িটা আসমান থেকে পড়েছে?—তাই তো বটে! ওর সঙ্গে ওটি কে?

মাধব কিছু রক্তিমকান্তি হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবান্তর প্রকাশ ও প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া কহিলেন, "কনকের কি স্বভাব দেখেছ? কপালে বিধাতা এত দুঃখ লিখেছেন, তবু হেসে হেসে মরে।"

মথুর। তা হোক—সঙ্গে কে?

মাধব। তা আমি কেমন ক'রে বল্‌ব, ঘোমটা দেখছ না?

বস্তুতঃ কনক ও তাহার সঙ্গিনী কলসীকক্ষে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। কনককে সকলেই চিনিত; কিন্তু দ্বিতীয় কুলকামিনীর প্রতিপদসঞ্চারে যে অনির্বচনীয় রূপলাবণ্য বিকশিত হইতেছিল, তাহাতে মাধব ও মথুর মুগ্ধ হইলেন। এই সময় সহসা মন্দ সমীরণ-হিল্লোল তরুণীর অবগুণ্ঠনটি উড়াইয়া ফেলিল। মুখ দেখিয়া মাধব বিস্মিতের ন্যায় ললাট আকুঞ্চিত করিলেন। মথুর কহিলেন, "ওই দেখ—তুমি ওকে চেন।"

মাধব। চিনি। আমার শ্যালী।

মথুর। তোমার শ্যালী? রাজমোহনের বৌ?

মাধব। হাঁ।

মথুর। রাজমোহনের বৌ, অথচ আমি কখন দেখি নি?

মাধব। দেখবে কি ক'রে? উনি কখন বাড়ীর বা'র হন না।

মথুর। হন না, ভবে আজ হয়েছেন কেন ?

মাধব। কি জানি।

মথুর। রাজমুহুনে গোবর্ধনের বৌ এত সুন্দর !

মাধব। বিয়েকে বলে সুরতি খেলা *।

এইরূপ আর কিছু কথোপকথনের পর উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

৩

কনকময়ী ও তাহার সঙ্গিনী নীরবে গৃহাভিমুখে চলিল। ক্রমে তাহারা আপনাপন গৃহের নিকট আসিল। তখন নবীনা কনককে বলিল, "কি পোড়া কপালে বাতাস দিদি, আমাকে কি নাস্তানাবুদই ক'রল !"

কনক হাসিয়া কহিল, "কেন, তোমার ভগ্নীপতি কি কখন তোমার মুখ দেখে নি ?"

নবীনা। আমি তো তার জন্য বলছি না—অন্য একজন যে কে ছিল।

কনক। কেন, সে যে মথুরবাবু; তাকে কি কখন দেখ নাই ?

নবীনা। কবে দেখলাম ?—আমার ভগ্নীপতির জ্যেঠাত ভাই মথুরবাবু ?—কি লজ্জা বোন, কারো কাছে বলিস্ না।

কনক। মরণ আর কি ! আমি লোকের কাছে গল্প ক'রতে যাচ্ছি যে, তুমি জল আনতে ঘোমটা খুলে মুখ দেখিয়েছিলে।

এই বলিয়া কনক মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। নবীনা সরোষে কহিল, "তুমি ভাগাড়ে পড় না কেন ? কথার রকম দেখ। এমন জানলে কি আমি তোমার সঙ্গে আসতাম ?"

---

* জুয়াখেলা।

কনক আবার হাসিতে লাগিল ; যুবতী পুনরায় বলিল, "তোর ও হাসি আমার ভাল লাগে না—সর্বনাশ ! দুর্গা যা করেন।"

এই বলিয়া নবীনা গৃহাভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিতকলেবর হইল। কনকময়ীও সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া এই আকস্মিক ভয়ের কারণ বুঝিতে পারিল। দেখিতে পাইল যে, দ্বারে অগ্নিবিচ্ছুরিত নয়নে কালমূর্তির ন্যায় রাজমোহন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কনক সঙ্গিনীর কানে কানে বলিল, "আজ দেখছি মহাপ্রলয় ; আমি তোর সঙ্গে যাই, যদি অকূলে কাণ্ডারী হ'তে পারি।"

রাজমোহনের স্ত্রী সেইরূপ মৃদুস্বরে কহিল, 'না, না, তুমি থাকলে হয়তো হিতে বিপরীত হবে, তুমি বাড়ী যাও।"

ইহা শুনিয়া কনক অন্য পথে নিজ গৃহে গেল। নবীনা যখন গৃহে প্রবেশ করিল, তখন রাজমোহন কিছুই বলিল না। তাহার স্ত্রী জলকলসী লইয়া পাকশালায় রাখিলে রাজমোহন কলসীটি লইয়া আঁস্তাকুড়ে জল ঢালিয়া ফেলিল। রাজমোহনের একটি প্রাচীনা পিসী ছিলেন। পাকের ভার তাঁরই উপর ; তিনি এইরূপ জলের অপচয় দেখিয়া রাজমোহনকে ভৎ'সনা করিয়া কহিলেন, "আবার জলটা মিছামিছি নষ্ট করছিস্ কেন রে ? তোর ক'গণ্ডা দাসী আছে যে, আবার জল এনে দিবে ?"

"চুপ কর্ মাগী হারামজাদী" বলিয়া রাজমোহন বারিশূন্য কলসীটা বেগে দূরে নিক্ষেপ্ করিল ; এবং স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু অথচ অন্তর্জ্বালাকর স্বরে কহিল, "তবে রাজরাণী, কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?"

তরুণী অতি মৃদুস্বরে দৃঢ়তা সহকারে কহিল, "জল আনতে গিয়েছিলাম।"

রাজমোহন ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "জল আনতে গিয়েছিলে ! কাকে ব'লে গিছলে ঠাকরুন ?"

তরুণী। কাকেও ব'লে যাই নি।

রাজমোহন আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া কহিল, "কাকেও ব'লে যাও নি—আমি দশ হাজার বার বারণ করেছি না?"

তরুণী পূর্বমত মৃদুভাবে কহিল, "করেছ।"

রাজমোহন। তবে গেলি কেন হারামজাদী?

তরুণী অতি গর্বিত বচনে কহিল, "আমি তোমার স্ত্রী।" তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। বলিল, "গেলে কোন দোষ নাই ব'লে গিয়েছিলাম।"

অসমসাহসের কথা শুনিয়া রাজমোহন একেবারে অগ্নিসম হইয়া উঠিল এবং ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ দিয়া স্ত্রীর কোমল কর বজ্রমুষ্টে এক হস্তে ধরিয়া প্রহারার্থ দ্বিতীয় হস্ত উত্তোলন করিল।

তরুণী একপদও সরিয়া গেল না, কেবল এমন কাতর চক্ষে রাজমোহনের দিকে চাহিয়া রহিল যে, তাহার হস্ত যেন মন্ত্রমুগ্ধ রহিল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া রাজমোহন পত্নীর হস্ত ত্যাগ করিল এবং বজ্রনিনাদে কহিল, "তোকে লাথিয়ে খুন কর্‌ব।"

তথাপি তরুণী কোন উত্তর করিল না, কেবল চক্ষে অবিরল জলধারা বিগলিত হইতেছিল। ইহা দেখিয়া নিষ্ঠুর রাজমোহন কিছু নরম হইল। সে প্রহারে বিরত হইল বটে, কিন্তু তাহার রসনা অবাধে কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। তরুণী সকলই নীরবে সহ্য করিল। ক্রমে রাজমোহন শান্ত হইল। তখন প্রাচীনা পিসীর একটু সাহস হইল। তিনি ধীরে ধীরে ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূর কর ধারণ করিয়া তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং যাইতে যাইতে ভ্রাতুষ্পুত্রকে দুই-এক কথা শুনাইয়া দিলেন। রাজমোহন তখন নিজের মনের বিষে নিজে জর্জরিত, পিসীর মুখনিঃসৃত ভাষালালিত্যের বড় রসাস্বাদন করিতে পারিল না।

৪

পূর্বাঞ্চলে কোন ধনাঢ্য ভূস্বামীর আলয়ে বংশীবদন ঘোষ নামে এক ভৃত্য ছিল। এই ভূস্বামী বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সন্তানের মুখাবলোকন না করিয়া শেষ বয়সে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পত্নীরও সন্তান হইল না।

মধ্যে মধ্যে দুই সপত্নীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত করিতেন; কখন কখন কর্তার নিকটে আসিয়া উভয়ে চীৎকারের মহলা দিতেন; কখন বা কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার কাপড় টানিয়া ছিঁড়িতেন; জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার চুল টানিয়া ছিঁড়িতেন। এমনও কখন হইয়াছে যে, ছেঁড়াছিঁড়ি নাক-কান পর্যন্ত উঠিয়াছে।...শেষে করাল কাল মধ্যস্থ হইয়া বড়কে আগে অন্তর্হিত করিল।

বয়োধিকা পত্নীর মৃত্যুতে প্রাচীন মনে করিলেন, "আমাকেও কোন্ দিন ডাক পড়ে। মরি তাতে ক্ষতি নাই, বারো ভূতে বিষয়টা খাবে।"

প্রেয়সী যুবতী স্ত্রী করুণাময়ীর সাক্ষাতে মনের কথা বলিলে তিনি বলিলেন, "কেন আমি আছি, আমি কি তোমার বারো ভূত?" বৃদ্ধ কর্তা কহিলেন, "তুমি যেখানে এক বিঘা জমি স্বহস্তে দান-বিক্রয় করতে পারবে না, সেখানে তুমি আর বিষয় ভোগ করলে কি?" চতুরা করুণাময়ী কহিলেন, "তুমি মনে করলে সব পার; বিষয় বিক্রয় ক'রে আমায় নগদ টাকাটা দাও না।" "তথাস্তু" বলিয়া ভূস্বামী ভূমি বিক্রয় করিয়া অর্থসঞ্চয়ে মন দিলেন। পরে যখন বৃদ্ধ লোকান্তরে গমন করিলেন, তখন তাঁহার বিপুল সম্পত্তি প্রায় স্বর্ণরৌপ্যরাশিতেই ছিল—সকলই করুণাময়ীর হইল।

খানসামা বংশীবদন ঘোষের উপর করুণাময়ীর বড় কৃপাদৃষ্টি পড়িল। তাঁহার অনুগ্রহে খানসামা বাবু অতি শীঘ্র সদর নায়েব হইয়া বসিলেন। কিছুদিন পরে করুণাময়ীর সামান্য জ্বর হইল; জ্বরটা অকস্মাৎ বৃদ্ধি

পাইল; তিনি অতি শীঘ্র এ জগৎ ত্যাগ করিয়া মৃত স্বামীর অনুবর্তিনী হইলেন। লোকে বংশীবদনের নানারূপ নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ কেহ এমনও কহিল যে, সে ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার জন্য করুণাময়ীকে বিষপান করাইয়াছিল। যাহা হউক, করুণাময়ী প্রাণত্যাগ করিলেন।

"যঃ পলায়তি স জীবতি"—বংশীবদন তৎক্ষণাৎ চাকরি পরিত্যাগ করিয়া বাটী আসিল। করুণাময়ীর বিপুল অর্থরাশি যে তাহার সঙ্গে আসিল, তাহা বলা বাহুল্য। অপর্যাপ্ত ধনের অধিপতি হইয়াও বংশীবদন, পাছে অসম্ভব ব্যয়ভূষণ করিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় অতি সাবধানে কালযাপন করিতে লাগিল। সে পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্রেরা সেরূপ সাবধানতা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। দীর্ঘকাল গত হওয়ায় নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহারা ভূসম্পত্তি ক্রয় ও অট্টালিকাদি নির্মাণ করিলেন এবং পৈতৃক ধনরাশির উপযুক্ত ঐশ্বর্য বিস্তার করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

বংশীবদনের জ্যেষ্ঠপুত্র রামকান্ত অতি বিষয়কার্যদক্ষ ছিলেন। সেজন্য তাঁহার অংশ সংবর্ধিত হইয়া দ্বিগুণাধিক হইল। রামকান্ত এই সম্পত্তি তাঁহার একমাত্র পুত্র সুযোগ্য মথুরমোহনের হস্তে সমর্পণ করিয়া যথাকালে পরলোকে গেলেন।

রামকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ইংরেজী স্কুল ইত্যাদি যে-সকল স্থান বিদ্যাশিক্ষার জন্য তখন সংস্থাপিত হইতেছিল, সে সকলই কেবল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কৌশলমাত্র। সুতরাং মথুরমোহনের কখন ইংরেজী বিদ্যালয় দর্শন করা হয় নাই। বাল্যাবধি বিষয়কর্মে পিতার সহযোগী হইয়া তাহাতে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা জন্মিয়াছিল। প্রজাপীড়ন, তঞ্চকতা ও অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি বিদ্যায় তিনি খুব নিপুণতা অর্জন করিয়াছিলেন।

বংশীবদনের দ্বিতীয় পুত্র রামকানাই অন্যরূপ ছিলেন। স্বভাবতঃ অলস

ও অমিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়া অল্পকালমধ্যেই তাঁহার বিষয়ব্যবস্থায় নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। তাঁহার যেমন বাটী, যেমন বাগান, যেমন আসবাব, এমন অন্য কোন বাবুরই নয়। কিন্তু তাঁহার জমিদারী সর্বাপেক্ষা বেবন্দোবস্ত ও লাভশূন্য। শেষে কয়েকজন শঠ চাটুকারের পরামর্শে, ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ করিতে পারিবেন আশায়, তিনি কলিকাতায় আসিলেন এবং ঐ ধূর্তদিগের করে পতিত হইয়া হৃতসর্বস্ব হইলেন। পরিশেষে ঋণের দায়ে তাঁহার সকল ভূসম্পত্তি নিলামে চড়িল।

কিন্তু রামকানাই ব্যবসায় উপলক্ষে কলিকাতায় আসায় এক উপকার হইয়াছিল,—রাজধানীবাসীদের দেখাদেখি তিনি তাঁহার পুত্র মাধবকে কলিকাতায় যতদূর সম্ভব ততদূর সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। আর মনুষ্যজন্মের সাধ মিটাইয়া তিনি এক পরমা সুন্দরী বালিকার সহিত মাধবের বিবাহ দিয়াছিলেন।

কলিকাতার নিকটবর্তী কোনও গ্রামে এক দরিদ্র কায়স্থ বাস করিতেন। রূপে ও গুণে তাঁহার দুই কন্যার তুল্য আর কোন রমণী সে অঞ্চলে ছিল না। কিন্তু রূপেই বা কি করে, চরিত্রেই বা কি করে,—অদৃষ্টদোষে কায়স্থের জ্যেষ্ঠাকন্যা মাতঙ্গিনীর নীচপ্রকৃতি রাজমোহনের সহিত বিবাহ হইল।

রাজমোহনের পিতা তাহার জন্য বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে বা তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই। কিন্তু রাজমোহন কর্মঠ ও পরিশ্রমী—নানা উপায়ে সংসার প্রতিপালন করিয়া থাকে। সে কখন তেমন অভাব-অনটন ভোগ করে না। তাহার উপর তাহার বাটীও নিকটে। এজন্য মাতঙ্গিনীর পিতার রাজমোহনকে বড় পছন্দ হইল—মাতঙ্গিনী দুষ্ট রাজমোহনের হস্তে সমর্পিত হইল। কনিষ্ঠা হেমাঙ্গিনী অধিকতর ভাগ্যবতী—মাধবের সহিত তাহার বিবাহ হইল।

মাধবের কলেজের পড়া শেষ হইবার কিছু পূর্বে রামকানাই

লোকান্তরে গেলেন। মাধব পিতার মৃত্যুর পর একরূপ নিঃসম্বল হইতেন, কিন্তু অদৃষ্ট প্রসন্ন। বংশীবদনের কনিষ্ঠপুত্র রামগোপাল, জ্যেষ্ঠের ন্যায় ধনসম্পত্তিশালী না হইলেও মধ্যম রামকানাইয়ের ন্যায় হতভাগ্য ছিলেন না। রামগোপাল, রামকানাইয়ের পরই পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সন্তান-সন্ততি ছিল না। তিনি এই মর্মে উইল করিলেন যে, মাধব তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন, বিধবা স্ত্রী যতদিন মাধবের ঘরে বাস করিবেন ততদিন তাঁহার নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন মাত্র।

৫

পিতৃবিয়োগের পরেও মাধব কলেজে অধ্যয়নশেষ পর্যন্ত রহিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার কর্মচারীরা বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে মাধব সস্ত্রীক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া রাধাগঞ্জে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দেশে যাইবার পূর্বে বিদায় গ্রহণের জন্য তিনি হেমাঙ্গিনীকে লইয়া শ্বশুরালয়ে আসিলেন।

মাতঙ্গিনী এবং রাজমোহনও তখন সেখানে ছিল। রাজমোহন সুযোগ বুঝিয়া মাধবের নিকট নিজের দুঃখের কাহিনী প্রকাশ করিল; বলিল, "পূর্বে কোনরূপে দিনপাত করেছি, কিন্তু এখন কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়েছে; আমাদের সহায় মুরুব্বী আপনি ছাড়া আর কেউ নাই। আপনি অনুগ্রহ করলে অনেকের কাছে ব'লে দিতে পারেন।"

মাধব জানিতেন যে, রাজমোহন অতি অসৎ-প্রকৃতি, কিন্তু সরলা মাতঙ্গিনী তাহার গৃহিণী হইয়া যে গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট পাইতেছিল, ইহাতে মাধবের মনে রাজমোহনের উপর মমতা হইল। তিনি বলিলেন, "আমার বরাবরই ইচ্ছা যে, কোন বিশ্বস্ত আত্মীয়ের হাতে বিষয়কর্মে

কতক ভার দিয়া নিজে কিছুটা ঝঞ্ঝাট এড়াই, তা আপনি যদি এ ভার নেন তবে তো বেশ ভালই হয়।"

রাজমোহন সম্মত হইল এবং মাতঙ্গিনীর সহিত মাধবের পশ্চাতে রাধাগঞ্জে যাত্রা করিল।

রাধাগঞ্জে উপস্থিত হইয়া মাধব রাজমোহনকে কার্যের নামমাত্র ভার দিয়া অতি সুন্দর বেতন নির্ধারণ করিয়া দিলেন। গৃহ নির্মাণ করিতে নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলেন এবং তাহা নির্মাণের প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী আহরণ করিয়া দিলেন। রাজমোহন বিনা নিজ ব্যয়ে নিজের উপযুক্ত পরিপাটী গৃহ স্বল্পকালমধ্যে নির্মাণ করিল। সেই গৃহেই এই গল্পের সূত্রপাত।

রাজমোহন যদিও উচ্চ বেতনভোগী হইল, তথাপি মাধব সন্দেহ করিয়া তাহার উপর কোনও গুরুতর কার্যের ভার দিলেন না। প্রতিপালনার্থ বেতন দিতেন মাত্র। রাজমোহনের কালক্ষেপণের উপায়াভাব—মাধব তাহাকে কৃষকের দ্বারা চাষের যোগ্য বহু জমি দিলেন; রাজমোহন প্রায় এই কাজেই ব্যাপৃত থাকিত।

এইরূপে মাধবের নিকট বহু উপকার পাইলেও রাজমোহন কখন সেজন্য কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত না। রাধাগঞ্জে আসা অবধি রাজমোহন মাধবের সহিত অতিশয় অপ্রীতিকর ব্যবহার করিতে লাগিল এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক সামান্যই রহিল।

রাজমোহনের এইরূপ অদ্ভুত আচরণ মাধব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াই চলিতেন—সেজন্য তাঁহার বদান্যতারও কিছুমাত্র লাঘব হইত না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, মাতঙ্গিনী ও হেমাঙ্গিনী পরস্পরকে যারপরনাই ভালবাসিলেও তাহাদের একরূপ দেখাশুনাই হইত না। হেমাঙ্গিনী কখন কখন স্বামীকে অনুরোধ করিয়া দিদিকে আনিবার জন্য শিবিকা পাঠাইত, কিন্তু রাজমোহন প্রায় মাতঙ্গিনীকে ভগিনীগৃহে যাইতে

দিত না। হেমাঙ্গিনী মাধবের স্ত্রী হইয়াই বা কিরূপে রাজমোহনের বাটীতে আসিবে ?

৬

মাধব বাগান হইতে বাটীতে ফিরিলে একজন লোক তাঁহার হস্তে একখানা চিঠি দিল। চিঠির উপরে 'জরুরী' লেখা। মাধব ব্যস্ত হইয়া তাহা পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। জেলার সদর হইতে তাঁহার মোক্তার সেই চিঠি পাঠাইয়াছেন। তাহা এইরূপ—

"মহিমার্ণবেষু—

অধীন এ মোকামে থাকিয়া হুজুরের মোকদ্দমা তদ্বিরে নিযুক্ত আছে। ভরসা করি সর্বত্র জয়লাভ হইবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, সম্প্রতি অকস্মাৎ এক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। হুজুরের শ্রীমতী খুড়ীমাতার উকীল হুজুরের নামে অদ্য এ মোকামের প্রধান সদর আপিল আদালতে এই দাবিতে মোকর্দমা রুজু করিয়াছেন যে, রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের উইল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনামূলক,—হুজুর কর্তৃক জাল উইল প্রস্তুত হইয়া বিষয়াদি হইতে তিনি বেদখল হইয়াছেন। অতএব তিনি সমেৎ ওয়াশিলাত তাবৎ বিষয়ে দখল পাওয়ার ও উইল রদের দাবি করেন।"

চিঠিখানা বিস্মিত মাধবের হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। তাঁহার যারপরনাই ক্রোধের সঞ্চার হইল। বহুক্ষণ চিন্তার পর তিনি চিঠিখানা তুলিয়া লইলেন এবং কপালের ঘাম মুছিয়া পুনঃ পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।—

"ইঁহার ছলাদার * কে অধীন সে বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিতেছে ও করিবেক। অধীন পরস্পর শ্রুত হইল যে, কোনও অতি প্রধান ব্যক্তির কুপরামর্শমতে এ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে।"

---

* সলাদার, পরামর্শদাতা।

মাধব ভাবিতে লাগিলেন, কে কুপরামর্শ দিয়াছে ? কিন্তু অনেক ভাবিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পুনরায় পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।—

"অধীনের বিবেচনায় হুজুরের কোনও শঙ্কা নাই, কেন না, 'যতো ধর্ম্মঃ ততো জয়।' কিন্তু যেরূপ বিপক্ষের সহায় দেখা যাইতেছে, তাহাতে সতর্কতার আবশ্যক। —বাবুদিগের এক্ষণে ওকালতনামা দেওয়া আবশ্যক—পশ্চাৎ সময়ে সময়ে সদর হইতে উকীল কৌন্সিলী আনান কর্তব্য হইবেক। তৎপক্ষে হুজুরের যেরূপ মরজি। আজ্ঞাধীন প্রাণপণে হুজুরের কার্যে নিযুক্ত রহিল—সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিবেক না। ইতি তারিখ—

আজ্ঞানুবর্তী শ্রীহরিদাস রায়।"

"পুনশ্চ নিং—

আপাতত মোকর্দমার খরচ প্রায় হাজার টাকার আবশ্যক হইবেক। যেরূপ হুজুর বুঝিবেন সেইরূপ করিবেন।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়াই মাধব খুড়ীর অনুসন্ধানে গৃহমধ্যে চলিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি তাঁহার এক মাসীকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুড়ী কোথা, মাসী ?"

মাসী। আমিও তাই ভাবছিলাম, আজ সকাল বেলা থেকে কেউই তাঁকে দেখে নাই।

মাধব বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "সকাল অবধি নাই! তবে সকলই সত্যি !"

মাসী। কি সত্যি বাপু ?

মাধব। কিছু না—পরে বলব। খুড়ী তবে কোথায় ? কারো সঙ্গে কি তাঁর আজ দেখা হয় নাই ?

অন্তরাল হইতে একজন স্ত্রীলোক মৃদুস্বরে কহিল, "আমি নাবার বেলা বড় বাড়ীতে তাঁকে দেখেছিলাম।"

মাধব অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "বড় বাড়ীতে! মথুরদাদার ওখানে!"

তাঁহার মনোমধ্যে এক নূতন সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, "তবে কি এ মথুরদাদার কর্ম? না, না, তা হ'তে পারে না—আমি অন্যায় দোষ দিতেছি।" পরে প্রকাশ্যে বলিলেন, "করুণা, তুই বড় বাড়ীতে যা,—খুড়ীকে ডেকে আন্; যদি না আসেন, তবে কেন আসবেন না, জিজ্ঞাসা করিস্।"

৭

এদিকে মাতঙ্গিনী স্বামীর তিরস্কারের পর পিসশাশুড়ী কর্তৃক নিজ শয়নকক্ষে আনীত হইলে, কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া মনের দুঃখে শয়ন করিল। রাত্রে পাকাদির পর পিসশাশুড়ী তাহাকে আহারার্থে ডাকিলেন, কিন্তু মাতঙ্গিনী শয্যা ত্যাগ করিল না। ননন্দা কিশোরী আসিয়া অনেক অনুনয় সাধনাদি করিল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। মাতঙ্গিনী অনশনে রহিল।

মাতঙ্গিনী শয্যায় শুইয়া আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। মাতঙ্গিনীর প্রতি রুষ্ট হইলে রাজমোহন প্রায় শয়নাগারে আসিত না, সুতরাং অস্ত রাত্রে যে আসিবে না, ইহা মাতঙ্গিনী উত্তমরূপে জানিত।

ক্রমে রজনী গভীর হইল। একে একে গৃহস্থ সকলে নিদ্রামগ্ন হইলেন। সর্বত্র নীরব হইল। মাতঙ্গিনী মন হইতে চিন্তা দূর করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ক্রমে গ্রীষ্ম দুঃসহ হইয়া উঠিল; মাতঙ্গিনী গবাক্ষ মুক্ত করিবার জন্য শয্যা ত্যাগ করিয়া সেদিকে গেল।

মুক্ত করিবে, এমন সময়ে যেন কেহ মৃদু পদসঞ্চারে সেই দিকে অতি সাবধানে আসিতেছে—এইরূপ লঘু শব্দ শুনিতে পাইয়া শঙ্কিত হইল। সে নিস্পন্দ শরীরে কান তুলিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশ পদশব্দ আরও নিকটে আসিল, পরক্ষণেই দুইজন কানে কানে কথা বলিতেছে শুনিতে পাইল। দুই-চারি কথায় মাতঙ্গিনী নিজ স্বামীর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল; তাহার ত্রাস ও কৌতূহল দুই-ই সংবর্ধিত হইল। দরমার বেড়ামাত্র ব্যবধান—সুতরাং মাতঙ্গিনী কথোপকথনের প্রায় সমস্তই শুনিতে পাইল। এক ব্যক্তি কহিতেছিল, "এ ঘরে কে থাকে?"

রাজমোহন। সে কথায় দরকার কি?

অপরিচিত। বলতেই বা ক্ষতি কি?

রাজমোহন। এ আমার ঘর, আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কেউ এখানে থাকে না।

অপরিচিত। তোমার স্ত্রী ঘুমিয়েছে?

রাজমোহন। বোধ করি ঘুমিয়েছে।

অপরিচিত। তুমি আমাদের কাজে লাগবে?

রাজমোহন। লাগি, যদি যা চাই, তাই দাও।

অপরিচিত। আচ্ছা, কি নেবে বল?

রাজমোহন। তুমি আগে বল দেখি আমায় কি করতে হবে?

অপরিচিত। যা বরাবর করেছ, তাই করবে; মাল বই ক'রে দেবে। নগদ ছাড়া যা-কিছু পাব, তা তোমার কাছে রেখে যাব।

রাজমোহন। বুঝেছি, তোমরা বেশ বুঝেছ যে, এত বড় বাড়ীতে একটা কর্ম হ'লে এ দিকেও একটা তল্লাস-তাগাদার বড় রকম-সকমই হবে। তাই তোমরা চাও যে, যতদিন না লেঠাটা মিটে ততদিন আমার কাছে সব থাকে। তা বড় মন্দ মতলব নয়; আমি ভায়রাভাই,

আমাকে কোন্ শালা শোবে * করবে ? অতএব আমার দ্বারা যে কাজ হবে, আর কারো দ্বারা তেমনটি হবে না। কিন্তু আমি সিকি ভাগ চাই।

দস্যু ভালরূপ জানিত যে, রাজমোহনের এ বিষয়ে কাজে কথায় এক—অতএব বাক্যব্যয় বৃথা। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সে সম্মত হইল। বলিল, "তাই হবে ; কিন্তু আর একটা কথা আছে।"

রাজ। আর এক মুঠো টাকা।

দস্যু। তা তো বটেই। আমরা মাধব ঘোষের যথাসর্বস্ব লুঠব, সে কেবল আমাদের নিজেদেরই জন্যে ; কিন্তু পরের একটা কাজ আছে।

রাজমোহন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ ?"

দস্যু। তার খুড়ার উইলখানা চাই।

রাজমোহন কিছু চমকিয়া কহিল, "হুঁ।"

দস্যু। কিন্তু উইলখানা কোথায় আছে আমরা তা জানি না। আমরা তো সমস্ত রাত্রি কেবল কাগজ উটকাইয়া বেড়াতে পারব না। কোথায় আছে সে খবরটা তুমি অবশ্য জান।

রাজ। জানি ; কিন্তু কার জন্য উইল চাই ?

দস্যু। তোমাকে বলতে বারণ।

রাজ। মথুর ঘোষ ?

দস্যু। যে-ই হোক, কিছু মজুরি দেবে, আমরা কাজ তুলে দেব।

রাজ। আমারও ঐ কথা। আমায় কি দিবে বল ?

দস্যু। তুমিই বল না।

রাজ। পাঁচ শ' খানি দিও।

* সন্দেহ।

দস্যু। এটা বড় জিয়াদা হচ্ছে; আমরা মোট দু’ হাজার পাব, তার মধ্যে সিকি দিই কেমন ক’রে ?

রাজ। তোমাদের ইচ্ছা।

দস্যু পুনর্বার চিন্তা করিয়া কহিল, “আচ্ছা, তাই সই—পাঁচ শতই দিব।”

রাজ। মাধবের শোবার খাটের শিয়রে একটা নূতন দেরাজ-আলমারী আছে; তার সব নীচের দেরাজের ভিতর একটা বিলিতী টিনের ছোট বাক্সে উইল, কবালা, খত ইত্যাদি রেখে থাকে।

দস্যু। ভাল কথা; তবে চল জুটি গিয়া। এস, আর দেরি ক’রে লাভ নেই; চাঁদনি ডুবলে কাজ হবে—এখনকার রাত ছোট।

এই বলিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে গৃহের ছায়াবরণ হইতে বনের দিকে প্রস্থান করিল। মাতঙ্গিনী বিস্মিতা ও ভীতিবিহ্বলা হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল।

৮

ক্রমে মন স্থির হইলে মাতঙ্গিনী এই বিষম ব্যাপার মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। এ পর্যন্ত সে নিজ স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে চিনিত না; আজ তাহার চক্ষু উন্মীলিত হইল। যে করাল মূর্তি দেখিল, তাহাতে মাতঙ্গিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। এ পর্যন্ত ভাবিত যে, বিধাতা তাহাকে ক্রোধ-পরবশ দুর্জনের জীবনসঙ্গিনী করিয়াছেন; আজ জানিল যে, সে দস্যুপত্নী। কিন্তু জানিয়াই বা কি ? দস্যু-হস্ত হইতে পলাইবার উপায় আছে কি ?

মাতঙ্গিনী ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিল। পরক্ষণেই দস্যুদলের সঙ্কল্পিত যে দারুণ ঘটনা ঘটিবে তাহা তাহার স্মরণ হইল। তাহার শরীর রোমাঞ্চিত, শোণিত শীতল ও মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। নিজের

ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা অন্তর্হিত হইল। সে বুঝিল যে, সে না বাঁচাইলে হেমাঙ্গিনী ও মাধবের রক্ষা নাই। তখন সে স্থির করিল—যদি প্রাণ দিয়াও তাহাদের রক্ষা করিতে পারে, তবে তাহাও করিবে।

সে প্রথমে মনে করিল, গৃহের সকলকে জাগরিত করিয়া সকল ঘটনা বলিবে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে চিন্তা দূর হইল; ভাবিল, তাহাতে কোন উপকার হইবে না—বরং তাহার নিজের মহাবিপদের সম্ভাবনা। পরে বিবেচনা করিল যে, কেবল কনককে জাগাইয়া সকল জানাইবে এবং যাহা উচিত হয় পরামর্শ করিবে। সে জন্য সে বাটীর বাহিরে আসিয়া কনকের গৃহাভিমুখে চলিল।

কনকের গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া মাতঙ্গিনী ধীরে ধীরে করাঘাত করিল। কনকের মাতা কহিলেন, "কে রে?"

কনকের মাতা অতিশয় মুখরা—মাতঙ্গিনী কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "আমি গো।"

কনকের মাতা কোপযুক্ত স্বরে কহিলেন, "কে?—রাজুর বৌ বুঝি? এত রাত্রে তুমি এখানে কেন গা?"

মাতঙ্গিনী মৃদুস্বরে বলিল, "কনককে একটা কথা বলব।"

কনকের মাতা বলিলেন, "রাত্রে কথা কি আবার একটা? সারাদিন কথা ক'য়ে কি আশা মেটে না? ভালমানুষের মেয়েছেলে রাত্রে এ-বাড়ী ও-বাড়ী কি গা?—চল দেখি তোমার পিশেসের কাছে।"

মাতার তর্জন-গর্জনে কনকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; বৃত্তান্ত বুঝিয়া কনক বলিল, "মা, দুয়ারটা খুলে দাও, শুনিই না কি বলে।"

কনকের মাতা গর্জন করিয়া বলিলেন, "দেখ্ কন্‌কি, এমন মুড়ো ঝাঁটা তোর কপালে আছে।"

কনক নিস্পন্দ ও নির্বাক হইল। মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিল এবং পুনরায় গভীর চিন্তায় অভিভূত হইল।

ভাবিল, "কি করি? বিপদ একেবারে সম্মুখে।—আমি আপনিই যাই, এ ছাড়া অন্য উপায় নাই।"

মাতঙ্গিনী আর বিলম্ব করিল না। ঝটিতি একখানা চাদরে আপাদমস্তক আবরিত করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং কৌশলে বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিল। অঞ্জলিবদ্ধ করে ইষ্টদেবকে প্রণাম করিয়া দ্রুত পথ বহিয়া চলিল।

মাতঙ্গিনী পাগলিনীর ন্যায় ইতস্তত চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে কিছুকাল মধ্যে মাধবের অট্টালিকার খিড়কির দ্বারে উপস্থিত হইল। অনেকবার করাঘাত করিয়া মাতঙ্গিনী গৃহের ঝি করুণাকে নিদ্রোত্থিত করিল। নিদ্রাভঙ্গে করুণা অপ্রসন্ন হইয়া কহিল, "এত রেতে কে রে দোর ঠেঙ্গায়?"

মাতঙ্গিনী উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিল, "শীগগির—করুণা, শীগগির দ্বার খোল।" কিন্তু করুণা পূর্ববৎ পরুষ বচনে কহিল, "তুই কে যে তোকে আমি তিনপর রেতে দোর খুলে দেব?"

মাতঙ্গিনী সবিনয়ে কহিল, "তুমি শীগগির এস, এলেই দেখতে পাবে আমি চোর-ছ্যাচড় নই, মেয়েমানুষ।"

তখন করুণা আর গণ্ডগোল না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং মাতঙ্গিনীকে দেখিবামাত্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, "এ কি! ঠাকরুন, তুমি?"

মাতঙ্গিনী কহিল, "আমি একবার হেমের সঙ্গে দেখা করব—বড় দরকার; শীগগির আমাকে হেমের কাছে নিয়ে চল।"

করুণা মাতঙ্গিনীকে হেমাঙ্গিনীর কক্ষের দিকে লইয়া চলিল।

হেমাঙ্গিনী তখনও ঘুমায় নাই; সংবাদ পাইবামাত্র কক্ষের বাহিরে বারান্দায় আসিল। সে যারপরনাই বিস্মিত ও ব্যগ্রভাবে মাতঙ্গিনীকে তাহার এইরূপ অসময়ে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিল।

মাতঙ্গিনী বলিল, "তোমাদের বাড়ীতে ডাকাতি হবে—আমি তোমাদের সাবধান করতে এসেছি।"

স্তম্ভিতা হেমাঙ্গিনী অর্দ্ধস্ফুট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ডাকাতি!"

করুণাও ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

মাতঙ্গিনী বলিল, "করুণা, থাম। হেম, আস্তে। এখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? শীগগির গিয়ে তোর স্বামীকে সাবধান ক'রে প্রস্তুত হ'তে বল্।"

কিন্তু হেমাঙ্গিনীর তাহা করিবার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল—সে কোন উত্তর দিতে বা চলিতে পারিল না। অথচ আর সময় নষ্ট করাও চলে না। মাতঙ্গিনীর কথায় তখন করুণা মাধবকে সংবাদ দিতে ছুটিল। কিন্তু সে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, মাধব তাহার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না এবং মাতঙ্গিনীর মুখে সকল কথা শুনিতে চাহিতেছেন। তখন চাঁদ অস্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

অগত্যা মাতঙ্গিনী মাধবের নিকটে চলিল। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মাধব একটি মূল্যবান সোফার উপর হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। মাতঙ্গিনী কক্ষের এক পাশের দেয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে দেখিয়া মাধব চমকিয়া উঠিলেন এবং একটু উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু কাহারও মুখে কথা ফুটিল না।

অবশেষে মাতঙ্গিনী মাধবের বিব্রত অবস্থা ঘুচাইয়া প্রায় ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল, "আমি যা বলেছি, শুনেছ?"

মাধব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "শুনেছি।—তা কি সত্যি?"

মাতঙ্গিনী পূর্ববৎ অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিল, "সত্যি।"

মাধব। আজ রাত্রেই তারা আসবে?

মাতঙ্গিনী। হাঁ, আজ রাত্রেই, চাঁদ ডুবলেই তারা চড়াও করবে—আর চাঁদ ডুবতে আধ দণ্ডের বেশী বাকীও নাই।

মাধব। তাই নাকি? তা' হলেই তো মারা যাব দেখছি! কিন্তু দিদি, তুমি এ খবর জানলে কি ক'রে?

মাতঙ্গিনী এবার স্পষ্টতর কণ্ঠে উত্তর করিল, "আমাকে সে-কথা জিজ্ঞেস ক'রো না।"

মাধব। তোমার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার চিন্তাশক্তিও যেন লোপ পেয়েছে।

মাতঙ্গিনী তখন মাধবের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আরও স্পষ্টস্বরে বলিল, "তোমাকে কি আমি প্রবঞ্চনা করতে পারি, মাধব? আর তুমি কি মনে কর, এমন অসময়ে ও একলা আমি যে তোমার বাড়ীতে…"

মাধব বলিলেন, "সত্যি, আমি ভুল করেছিলাম। তুমি তোমার বোনের সঙ্গে এখানে থাক দিদি, আমি আমার লোকদের জাগাতে যাই।"

এই বলিয়া মাধব সোফা ছাড়িয়া উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মাতঙ্গিনী তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিল। বলিল, "মাধব, আর একটা কথা।"

মাধব। কি, বল।

মাতঙ্গিনী। তোমার খুড়ার উইল কোথায়?—সেটা সাবধানে রেখো। ওরা কিন্তু উইলটা চুরি করতে চায়।

মাধব যেন তাঁর খুড়ীমার মোকদ্দমার একটা হদিস পাইলেন। বলিলেন, "হুঁ, সেটি আর হচ্ছে না।"

মাতঙ্গিনী। তোমার নূতন দেরাজ-আলমারীর সব নীচের দেরাজে একটা ছোট বাক্সে সেটা থাকে, না?

মাধব। (সবিস্ময়ে) হাঁ—তুমি তা জানলে কি ক'রে ?

মাতঙ্গিনী। কেবল আমি কেন, তারাও তা জানে।

মাধব। এখন বুঝতে পারছি, তুমি সব কিছুই বেশ ভাল রকমই জান।—এই বলিয়া মাধব বাহিরে যাইবার জন্য উঠিলেন।

মাতঙ্গিনী। আমার আর একটা অনুরোধ আছে—রাখবে ?

মাধব। বল ; অবশ্য রাখব।

মাতঙ্গিনী। তুমি যে আমার কাছ থেকে এ খবর পেয়েছ—বা আমি যে আজ রাত্রে এখানে এসেছি, কাউকে তার কিছুই ব'লো না। বললে, আমার বাঁচা দায় হবে।

মাধব অবজ্ঞা ও ক্রোধভরে চড়া গলায় বলিলেন, "তোমার বাঁচা দায় হবে ?—কে তোমার কি করবে শুনি ?"

মাতঙ্গিনী। চুপ !

মাধব আপনাকে সামলাইয়া কহিলেন, "ওঃ, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমি চুপ ক'রেই থাকব, কথা দিচ্ছি।"

মাতঙ্গিনী। যাবার সময় করুণা আর হেমকেও ব'লো, তারাও যেন সোরগোল না করে।

মাধব। করুণাকে চুপ করানোই শক্ত—যাক্ গে, আমি তাকে শাসিয়ে ঠাণ্ডা রাখব। তুমি ও হেম ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে থাকবে ; বাড়ীর আর কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়। আমি ফিরে এসে তোমাকে আরো নিরাপদ ও নিরালা জায়গায় নিয়ে যাব।

এই বলিয়া মাধব তাঁহার স্ত্রী ও করুণার কাছে গিয়া, মাতঙ্গিনীর সম্বন্ধে তাহাদের একবারে চুপচাপ থাকিতে বলিয়া বাহির বাটীতে ছুটিয়া গেলেন এবং অবিলম্বে দারোয়ানমহলে উপনীত হইলেন।

ডাকাতদিগকে বাধা দিবার জন্য মাধব যথোচিত ব্যবস্থা করিলেন।

লাঠি, সড়কি ইত্যাদি লইয়া সজ্জিত হইয়া একদল লোক নীরবে ডাকাতদের আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে চাঁদ অস্ত গিয়াছে। ডাকাতদের দেখা নাই। মাতঙ্গিনীর কথায় মাধবের কিছু অবিশ্বাস হইতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে একজন দারোয়ান আসিয়া বলিল যে, পাহারার কাজে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে একজন পুরানো বাগানের দিকে একটা আলো দেখিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। সে সেখানে জন কতক সশস্ত্র লোককে দেখিয়া আসিয়াছে।

পরে দারোয়ানটি মাধবকে জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর, আমরা কি এগিয়ে গিয়ে ওদের উপর চড়াও করব?"

মাধব। না ভূপ সিং, তাড়াতাড়ি করবার দরকার নাই। তোমরা এক কাজ কর—সকলে মিলে হাঁক দিয়ে ঐ বদমাশদের বুঝিয়ে দাও যে, আমরা বেশ তৈরী আছি।

মাধবের কথা শেষ হইতে না হইতেই মধ্যরাত্রির বায়ুস্তর বিদীর্ণ করিয়া মহাহুঙ্কারধ্বনি উঠিল। মাধব বলিলেন, "আবার, আবার।"

আবার সেইরূপ হুঙ্কারে রজনী বিকম্পিত হইল। তাহার প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতে পুরানো বাগান হইতে এক ভয়ঙ্কর উল্লাসধ্বনি উঠিল। তাহা শুনিয়া যেন সকলের দেহের রক্ত হিম হইয়া গেল।

মাধব চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তোমরা আবার, আবার—আরো জোরে হাঁক দাও।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুচরেরা সোৎসাহে তাঁহার আদেশ পালন করিল। আবার তখনই পুরানো বাগান হইতে উত্তর আসিল। কিন্তু এবার আর উল্লাসধ্বনি নয়—পলায়নের সঙ্কেতধ্বনি। তাহা শুনিয়া মাধবের লোকদের মধ্যে কয়েকজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরা পালাচ্ছে, ওরা পালাচ্ছে—পালাবার শব্দ ওটা।"

মাধব বলিলেন, "হয়তো তাই—কিন্তু তোমাদের ঠকাবার জন্যেও ওরা ওরকম করতে পারে। তোমরা তৈরী-ই থাক।"

তাহার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাধব তাঁহার লোকজনদের লইয়া অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু আর কিছু ঘটিল না। তখন আর একবার সকলকে সারারাত্রি জাগিয়া সতর্ক পাহারা দিতে বলিয়া তিনি অন্তঃপুরের দিকে গেলেন।

৯

মাধব অন্তঃপুরে তাঁহার স্ত্রী ও মাতঙ্গিনীর নিকট ফিরিলেন। ফিরিয়াই তিনি মাতঙ্গিনীকে বলিলেন, "তুমি আমার জন্য যা করেছ, তা কি কখন ভুলতে পারি?"

এদিকে বুক হইতে আশঙ্কার বোঝা নামিয়া যাইতেই হেমাঙ্গিনী আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া গেল। তখন মাতঙ্গিনী মাধবকে বলিল, "আমি যা করেছি, তা ছাড়া অন্য কি করতে পারতাম? যাক্—আমি এখন আসি ভাই! করুণা আমার সঙ্গে চলুক। তুমি সুখী হও—আমার হেমকে নিয়ে সুখে থাক।"

মাধব। সে কি দিদি? হেম অনেক দিন তোমাকে দেখে নি—আর ঘণ্টা কতক সে তোমার সঙ্গে থাকতে পারলে যারপরনাই খুশী হবে। যদি বেশী থাকতে না পার, ভোর হ'লেই আমার পালকি ক'রে তোমাকে বাড়ী রেখে আসবে।

মাতঙ্গিনী নিতান্ত লজ্জিত ও দুঃখিত ভাবে বলিল, "তুমি তো ওঁকে ভাল রকমই জান—আমি থাকলে উনি রাগ করবেন।"

মাধব। বোনের বাড়ীতে থাকলেও রাগ করবেন! তিনি জানেন, তুমি কোথায় আছ?

মাতঙ্গিনী। না, আমি কোথায় আছি তা তিনি জানেন না।

মাধব। আশ্চর্য! তবে তুমি এলে কি ক'রে? তুমি বেরুবার সময় তিনি কি বাড়ীতে ছিলেন না?

মাতঙ্গিনী। আমাকে সে সব কথা জিজ্ঞেস ক'রো না।

ইহা শুনিয়া মাধবের মনে ক্ষণেকের জন্য একটা সন্দেহ জাগিল, তিনি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।···

ভোর হইতে ঘণ্টাখানেক বাকী, মাতঙ্গিনী বিষণ্ণচিত্তে ও মন্থর গতিতে বাড়ীর দিকে চলিল। করুণা নিঃশব্দে তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই আকাশ ক্রমে মেঘে কালো হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে, ঝড় উঠিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। তখন করুণা বলিল, "ঠাকুরুন, তাড়াতাড়ি চল, ঝড় আসছে, তার আগে বাড়ী পৌছানো চাই।"

মাতঙ্গিনী অন্যমনে উত্তর করিল, "হাঁ, তাই চল।"

করুণা দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাতঙ্গিনীও তাহার দেখাদেখি তাড়াতাড়ি চলিল।

ক্ষণকাল পরে করুণা বলিল, "ঐ শুন, গাছের পাতায় বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ছে।"

মাতঙ্গিনী ভাল করিয়া শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া বলিল, "না, এ বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ নয়—কে যেন গাছের ঝরা-পাতার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।"

"তাই নাকি ঠাকরুন?" বলিয়া করুণা আরও তাড়াতাড়ি চলিল—ভয়, পাছে ডাকাতের হাতে পড়ে।

কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতেই ঝড় উঠিল, বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল এবং বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িতে আরম্ভ করিল। তখন

করুণা বলিল, "বৃষ্টিতে ভিজে মারা যাব দেখছি। গাছতলায় দাঁড়ালে হয় না ?"

"বেশ, তাই চল।" বলিয়া মাতঙ্গিনী একটা বড় তেঁতুল গাছের তলায় আশ্রয় লইবার জন্ত অগ্রসর হইল। কিন্তু তখনই ক্ষণিক বিদ্যুতালোকে তাহারা দেখিতে পাইল যে, তাহাদের অল্প দূরে সেই গাছটিরই নীচে একজন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে।

দেখিয়াই করুণা চীৎকার করিয়া উঠিল, "পালাও! পালাও!" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বিমূঢ়া মাতঙ্গিনীকে টানিয়া লইয়া যথাশক্তি ছুটিতে আরম্ভ করিল। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ী বেশী দূরে ছিল না—সেখানে পৌছিতে অধিক সময় লাগিল না।

বাড়ী পৌছিয়া মাতঙ্গিনী করুণাকে বলিল, "তুমি এখানে থেকো না করুণা—বিপদ ঘটতে পারে। তুমি কনকদের বাড়ী গিয়ে তাদের বারান্দায় শুয়ে থাক—ঝড়টা একটু কমলে আর ভোর হ'লেই, ওদের বাড়ীর কেউ উঠবার আগেই চ'লে যেও।"

এই বলিয়া মাতঙ্গিনী তাহার শয়নকক্ষের দ্বার খুলিবার জন্ত অগ্রসর হইল। করুণা চলিয়া গেল।

মাতঙ্গিনী কৌশলে দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। সে পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিতে যাইবে, দেখিল, তাহার পরে আর একজন ঘরে ঢুকিয়া ভারী অর্গলটি পড়াইয়া দিল। পায়ের শব্দে মাতঙ্গিনী বুঝিতে পারিল যে, সে তাহারই প্রলয়ঙ্কর স্বামী।

রাজমোহন কোন কথা কহিল না, আলো জ্বালিয়া যথাস্থানে রাখিল। তার পর তক্তপোশের উপর বসিয়া নীরবে হিংস্রদৃষ্টিতে মাতঙ্গিনীর দিকে তাকাইয়া রহিল। সেই দৃষ্টি হইতেই মাতঙ্গিনী বুঝিতে পারিল যে, তাহার অদৃষ্টে কি আছে। কিন্তু সে ভীত না হইয়া সগর্বে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরিশেষে রাজমোহন বলিল, "হতভাগী, তুই আজ রাত্রে মাধব ঘোষের বাড়ী গিয়েছিলি কিনা বল্ !"

মাতঙ্গিনী উত্তেজিতভাবে উত্তর করিল, "হাঁ, গিয়েছিলাম, তোমাদের ডাকাতির হাত থেকে তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।"

রাজমোহন হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। হিংস্রভাবে বলিল, "মাগী, আমি তোকে খুন করব।" এই বলিয়া সে কোমরের বস্ত্রমধ্য হইতে একখানা ছোট ছোরা বাহির করিল। তাহা দেখিবামাত্র "মাগো, বাবাগো, তোমরা এখন কোথায়?" এই বলিয়া মাতঙ্গিনী অচেতনপ্রায় হইয়া মেঝেয় পড়িয়া গেল। রাজমোহন মাতঙ্গিনীর বক্ষে আঘাত করিবার জন্য ছোরা তুলিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ জানালার কাছে একটা ভয়ানক শব্দ হওয়ায় তাহার সে কাজে বাধা পড়িল। কিসের শব্দ, দেখিবার জন্য পিছন ফিরিতেই সে দেখিতে পাইল যে, ঝাঁপ খুলিয়া গেল এবং দুইজন কৃষ্ণকায় পালোয়ানের মত লোক একে একে লাফাইয়া ঘরে ঢুকিল। তাহাদের দেহ বৃষ্টিজলে সিক্ত ও কর্দমাক্ত—কিন্তু তাহাদের ভয়ঙ্কর রক্তচক্ষুগুলি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে।

নবাগতদের একজন রাজমোহনকে বলিল, "চোয়াড়, নিজের স্ত্রীকে খুন করবি নাকি?"

রাজমোহন হাতের ছোরা দুলাইয়া গর্জন করিয়া বলিল, "কে তোরা?—আমার ঘরে ডাকাতি!"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া নবাগতদের একজন উত্তর করিল, "আস্তে—তোমার বাড়ীর লোকেরা জেগে পড়বে। ডাকাত নয় বন্ধু, ভাল ক'রে দেখ, হয়তো আমাকে চিনতে পারবে।"

রাজমোহন বলিল, শত্রু হও বা মিত্র হও, আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া নবাগত বলিল, "তা হ'লেই তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে তোমার বৌকে সাবাড় করতে পার?"

রাজমোহন উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমি তাই করতে চাইলে, কে আমাকে ঠেকাতে পারে?" ইহা বলিয়াই সে ছুটিয়া নবাগতের বুকে ছোরা বসাইতে গেল। নবাগত বিদ্যুদ্বেগে একটু সরিয়া গিয়া সে আঘাত এড়াইল এবং মুহূর্তমধ্যে লৌহমুষ্টিতে রাজমোহনের হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া নিজের সঙ্গীকে বলিল, "ভিখু, আলোটা ধ'রে ওকে আমার মুখখানা দেখা তো। রাজু, আমার এ চাঁদমুখ দেখলে তুমি অবিশ্যি খুশী হবে।"—ভিখু প্রদীপটি আনিয়া তাহার সঙ্গীর মুখের কাছে ধরিল।

রাজমোহন সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সর্দার!"

সর্দার উত্তর করিল, "হাঁ, সর্দার। চিনতে পারলে দেখছি।"

রাজমোহন পূর্বের ন্যায় ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তোমরা এখানে কেন?"

সর্দার। আগে বল, তোমার বৌকে খুন করতে যাচ্ছিলে কেন।

রাজমোহন। তা দিয়ে তোমার কাজ কি? এখান থেকে স'রে পড়—নইলে আমি লাথি মেরে তোমাকে বাড়ী থেকে বের করব।

সর্দার মুখ সিটকাইয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "বটে! লাথি মার দেখি—বন্দী হ'য়ে তো রয়েছ!"

রাজমোহন গর্জন করিয়া বলিল, "আমার পা এখনও খোলা আছে"—এবং সর্দারকে এমন জোরে এক লাথি মারিল যে, সে রাজমোহনের হাত ছাড়িয়া কয়েক পা হটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ডাকাত ভিখু তাহার ভীম বাহুযুগলের দ্বারা রাজমোহনকে ধরিয়া ভূলুণ্ঠিত করিল। তখন সর্দার ব্যাঘ্রবিক্রমে রাজমোহনের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল, আর ভিখু একগাছা দড়ি দিয়া রাজমোহনের হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল।

তখন সর্দার রাজমোহনকে বলিল, "বেইমান, তুমি এখন আমাদের হাতে।"

রাজমোহন। হাঁ, তা বটে—দু'জন আর একজন। কিন্তু আমি কি করেছি যে, তোমরা আমার সঙ্গে এমন করছ?

সর্দার। কি করেছ?—বেইমানি করেছ। তুমি আগে খবর পাঠিয়ে তোমার ভায়রাভাইকে সাবধান ক'রে দিয়েছ, তোমার মরাই উচিত।

রাজমোহন সর্দারকে ভালরূপই চিনিত—তাহার নিজের জীবন সম্বন্ধে খুবই আশঙ্কা হইতেছিল—সে তীব্রকণ্ঠে সর্দারের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "আমি সত্যি বলছি, আমি খবর পাঠাই নি।—আমি তো বরাবরই তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।"

সর্দার। ঢের হয়েছে—আর আমাকে ছেলে ভুলাতে পারছ না। এই দেয়ালের ধারে আমার সঙ্গে যখন কথা বলছিলে তখন হয় তো তোমার স্ত্রী জেগেই ছিল, আর সে যাতে আমাদের কথা শুনে মাধব ঘোষকে খবর দিতে পারে, সে জন্যেই তুমি ঐরূপ করেছিলে। তুমি মাধবকে খবর দিয়েছ, কে জানে পুলিসকে খবর দিবে কিনা! তুমি বেঁচে থাকতে আমাদের মঙ্গল নেই—তোমাকে মরতেই হবে।

রাজমোহন খুব উত্তেজিতভাবে বলিল, "বেশ, তোমরা এখন ঘরে ঢুকে কি দেখলে? যাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছি বলছ, আমি কি তাকেই খুন করতে যাচ্ছিলাম না? তোমরা এসে বাধা না দিলে, সে এতক্ষণ ম'রে এখানে প'ড়ে থাকতো।"

সর্দার যেন একটু দ্বিধায় পড়িয়া ভিখুর মুখের দিকে তাকাইল।

ভিখু বলিল, "হাঁ সর্দার, ও ঠিকই বলছে।"

রাজমোহন তখন ভয়ে কাঁপিতেছিল, সে বলিল, "আমাকে যে জন্যে তোমরা দোষী করছ, ঠিক সেই জন্যেই আমি ওকে খুন করতে যাচ্ছিলাম।"

সর্দার তখন রাজমোহনকে ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "হাঁ, সেই মাগীকেই খুন কর্। ভিখু, রাজমোহনের বাঁধনটা খুলে দে।"

ভিখু তাড়াতাড়ি রাজমোহনের বাঁধন খুলিয়া দিল। তার পর সকলে মিলিয়া মাতঙ্গিনীর খোঁজ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাকে কোথাও পাইল না। তাহারা যখন বিবাদে মত্ত ছিল, তখন মাতঙ্গিনী তাহাদের অলক্ষিতে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

সর্দার উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "চল, মাগীকে ধরতে হবে—নইলে ও আমাদের সর্বনাশ করবে।"

রাজমোহন বলিল, "হাঁ, চল—কিন্তু সাবধান, আমি ছাড়া আর কেউ আমার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে পারবে না। তাকে খুঁজে পেলে, আমিই তাকে খুন করব; তা যদি না করি, তোমরা আমাকে খুন ক'রো। চল, আমি তোমাদের আগে আগে যাচ্ছি।"

তিনজনে দ্রুত বাড়ীর বাহির হইল। আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন, টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সকল দিকে মাতঙ্গিনীর অনুসন্ধান করিয়াও তাহারা তাহার কোন খোঁজ পাইল না। এদিকে দিন হইতে বিলম্ব নাই দেখিয়া দস্যুরা আর বাহিরে থাকা নিরাপদ মনে করিল না। তাহারা রাত্রিতে আবার কোথায় মিলিত হইবে তাহা স্থির করিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইল।

১০

বেলা প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। পুকুরের ধারে একটি তেঁতুল-গাছের নীচে লতাগুল্মের অন্তরালে মাতঙ্গিনী সিক্তবসনে ঘাসের উপর বসিয়া তাহার বৃষ্টিবিধৌত কেশপাশ সূর্যকিরণে শুকাইয়া লইতেছে। পার্শ্বেই কনক সদ্যতৈলমার্জিত দেহে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার স্কন্ধে ময়লা একখানা গামছা এবং পাশে পিতলের একটি শূন্য কলসী। সে

স্নানে চলিয়াছে। দুই সখী গতরাত্রের ঘটনার বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। কনক উৎকণ্ঠিতভাবে বলিয়া উঠিল, "আমি মিনতি করছি, আর তোর স্বামীর ঘরে যাস্‌নে দিদি! তারা তোকে খুন করবে।"

মাতঙ্গিনী বলিল, "জানি, আমাকে মরতেই হবে—কপালে যা আছে তা কে খণ্ডাতে পারে? আমি আর কোথায় আশ্রয় পেতে পারি, বল্।"—বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

কনক অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, "আমি বেশ জানি, তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকলে রক্ষা পাবে না। কিন্তু তুমি কিছুতেই তোমাদের বাড়ীতে ফিরে যেয়ো না। তুমি কেন তোমার বোনের কাছে যাও না?"

ইহা শুনিয়া মাতঙ্গিনী অশ্রু মুছিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "সেখানে আমি যেতে পারি না।"

মাতঙ্গিনীর রকমসকম দেখিয়া কনক আর কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সে আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল, "কিগো মায়েরা, তোমরা কাঁদছ কেন?"

সচকিত সখীদ্বয়ের পার্শ্বে যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে একজন শ্যামবর্ণা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক। তাহার পরিধানে একখানা মোটা পরিচ্ছন্ন ঠেঁটি, মুখ সদ্য তেলমাখানো, স্কন্ধে মলিন গামছা এবং কাঁকালে শূন্য কলসী—ইহা হইতেই তাহার সেখানে আগমনের হেতু বুঝিতে পারা যাইতেছিল।

তাহাকে দেখিয়াই কনক কান্না ভুলিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলিয়া উঠিল, "আরে, এ যে দেখতে পাচ্ছি সুকীর মা। হাঁ সুকীর মা, ফুলপুকুরে আজ হঠাৎ কি মনে ক'রে?"

উত্তরে সুকীর মা বলিল, "আজ উঠতে বড় দেরী হয়ে গেছে,

তাই ভাবলাম, কাজে লাগবার আগে চট্ ক'রে স্নানটা সেরে নি। তা বাছা, কি হয়েছে বল তো? তোমরা দু'জনেই কাঁদছ কেন?"

কনক বলিল, "সে কথা আর জিজ্ঞেস্ ক'রো না সুকীর মা, এ দুখিনীর দুঃখের কথা তোমাকে আর কি ক'রে বলব?"—মাতঙ্গিনী নীরব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কনককে সাবধান করিয়া দিল, যেন কনক তাহার দুঃখের কথা বিশেষ কিছু না বলে। কনকও ইঙ্গিতে তাহাকে আশ্বাস দিল। পরে সুকীর মাকে আবার বলিল, "ওর মন্দ কপালের কথা আর ব'লো না। দুখিনীকে ওর স্বামী বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন ও যে কোথায় আশ্রয় নেবে তা ভেবে পাচ্ছে না।"

সুকীর মা বলিল, "ছি, এতেই কি কাঁদতে আছে? স্বামীস্ত্রীতে সকালে ঝগড়া করে, আবার বিকেলে তাদের মিল হয়—এ কে ন জানে? এখন সে রেগে আছে, কিন্তু রাগ গেলেই সে তোমাকে বাড়ী যেতে সাধাসাধি করবে। ছি মা, তুমি সেজন্যে কাঁদ্ছ কেন? দেখ কনক, আমার জামাই যখন আমাদের বাড়ী আসে তখন এমন একটা রাত যায় না যে, সে আমার মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া না করে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? সে আমার মেয়েকে যেমন ভালবাসে তেমন আর কোন স্বামী তার স্ত্রীকে ভালবাসে না। এমন কি গেল বুধবারও জামাই আমার মেয়ের জন্যে সুন্দর একটা নথ নিয়ে এসেছিল। সে এমন নথ, কনক!"

কনক সুকীর মায়ের জামাইয়ের মধুর-প্রকৃতির বর্ণনা সম্পূর্ণ হইতে না দিয়া বলিল, "ঠিক বলেছ সুকীর মা, কিন্তু রাজুদা আর একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়—জঙ্গলবেড়ে থেকে যে সম্বন্ধ এসেছিল সেই মেয়ে। এখন বেশ বুঝতে পারছ, সে কেন এর সঙ্গে বারবার এমন ব্যবহার করছে। এ আর স্বামীর ঘরে যাবে না সুকীর মা। আর এমন হ'লে কোন স্ত্রীলোকেরই যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু দুখিনী

আর যাবেই বা কোথায়? বাপের বাড়ীই কি কাছে যে, সেখানে যাবে?"

দয়াবতী সুকীর মা বলিল, "কি পোড়া কপাল! স্বামী আবার বিয়ে করবে? কেন, এর চেয়ে সুন্দর বৌ সে কোথায় পাবে? না মা, তুমি আর বাড়ী ফিরে যেয়ো না—বরং তোমার বোনের বাড়ী গিয়ে দেখ, স্বামী কি করে।"

কনক উত্তর করিল, "বোনের বাড়ীতেও যেতে পারে না সুকীর মা! মাধববাবু তার বাড়ীতে গেল শ্রাদ্ধের সময় ওর স্বামীকে নেমন্তন্ন করে নি ব'লে ও ওর বোনের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। আমি অবিশ্যি ওকে আমাদের বাড়ীতে রাখতে পারতাম, কিন্তু আমরা যে গরিব মানুষ, আমাদের বাড়ীতে ওকে যে না খেয়ে মরতে হবে।"

সুকীর মা বলিল, "মরণ আর কি! কি বোকা মেয়ে গো! অমন স্বামীর জন্যে বোনের সঙ্গে ঝগড়া করে!—আচ্ছা, এস মা, আমার সঙ্গে এস! আমাদের গিন্নীর কাছে যতদিন খুশি থাকবে। বড় ঠাকরুন তোমাকে বড় ভালবাসেন, তুমি তাঁর কাছে থাকলে তিনি খুব খুশীই হবেন। পরে তোমার স্বামীর রাগ পড়লে, সে যখন তোমাকে বাড়ী যাবার জন্যে সাধাসাধি করবে—আর তা ক'রল ব'লে—তখন তুমি বাড়ী ফিরো। কিন্তু যেন চট ক'রে তার কথায় রাজী হ'য়ো না; আগে সে চোখের জলে ভেসে দাঁতে কুটো নেবে, তবে তুমি বাড়ী ফিরবে।"

কনক উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ সুকীর মা, তুমি ভাল কথাই বলেছ; ও এখন তোমার সঙ্গেই যাবে। কি বলিস্ বোন?"

ইহা শুনিয়া মাতঙ্গিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কিন্তু কনক তাহা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া আবার সুকীর মাকে বলিল, "হাঁ, হাঁ, ও যাবে। তুমি যাও সুকীর মা, নেয়ে এস, ও তোমার সঙ্গেই যাবে। যাও, আর দেরী ক'রো না।"

সুকীর মা স্নান করিতে গেল। তখন মাতঙ্গিনী কনককে বলিল, "কি বিপাকেই পড়েছি কনক!"

কনক জোরের সঙ্গে উত্তর করিল, "না বলিস্ না বোন—তা বললে, আমার রক্ত খাবি। এখন যা, সন্ধ্যেবেলা আমি তোর সঙ্গে দেখা করব।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া কনক তাড়াতাড়ি তাহার কলসীটি তুলিয়া লইল এবং দ্রুত জলের ধারে গিয়া সুকীর মায়ের সঙ্গে স্নানে নামিল।

১১

মথুর ঘোষের সুবৃহৎ বাড়ী চারিটি স্বতন্ত্র মহলে বিভক্ত। বাড়ার সম্মুখে লোহার পাতে মোড়া এক জোড়া ভারী কপাট পার হইলেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের তিন দিকে অনতিউচ্চ দোতলা বারান্দা। ফটকের বিপরীত দিকে সুপ্রশস্ত হল-ঘর। তাহার এক কোণে অন্দর-মহলে প্রবেশের দ্বার। অন্দর-মহলের মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ এবং সেই প্রাঙ্গণের চারিপাশে বহির্বাটীর ন্যায় দোতলা বারান্দা। এই মহল হইতে একটি সঙ্কীর্ণ পথে অগ্রসর হইয়া একটি দরজা পার হইলেই বাড়ীর তৃতীয় মহল। মধ্যস্থলে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ—তাহার দুই পাশে সারি সারি একতলা কুঠরি। এখানে বাড়ীর রন্ধনশালা। ইহার পশ্চাতে চতুর্থ মহল—গুদামবাড়ী। কিন্তু তৃতীয় মহল হইতে গুদামবাড়ীতে যাইবার কোন পথ আছে বলিয়া বোধ হয় না। বাড়ীর মেয়েরা বড় কেহ সেখানে যান না।

বাহির হইতে গুদামবাড়ীতে প্রবেশের একটি দরজা আছে। দরজাটি খুব স্থূল ও ভারী। মহলের তিন দিকে উচ্চ প্রাচীর। মহলের চতুর্থ দিকে একসারি একতলা ঘর। ঘরগুলির দেওয়াল অস্বাভাবিক পুরু;

দরজাগুলি ক্ষুদ্র, কিন্তু লোহার পাতে মোড়া। কোন ঘরেরই জানালা নাই। এই ঘরগুলি রকমারি জিনিস রাখিবার গুদামরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া সকলে জানিত।

গুদামবাড়ীর এক পাশে একটি প্রকাণ্ড সুপারিবাগান। তাহার মাঝে মাঝে বকুলগাছ। চারিদিক ইষ্টক-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং মধ্যস্থলে একটি পুষ্করিণী।—এই অংশটি বাড়ীর খিড়কি। রন্ধনশালার পাশ দিয়া আসিয়া একটি ছোট দরজা পার হইলেই খিরকির বাগান।...

অন্দর-মহলের দ্বিতলে মথুর ঘোষের শয়নকক্ষ। তাহার একটি জানালার ধারে এক শ্যামাঙ্গী সুন্দরী বসিয়া ছিলেন। তাঁহার বয়স আটাশ বৎসরের কাছাকাছি হইবে। তাঁহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার শাড়ি। হালকা স্বর্ণালঙ্কারে তাঁহার অঙ্গ শোভিত। জানালার গরাদে কয়েক গুচ্ছ চুল বাঁধা ছিল—রমণী তাহার দ্বারা কিশোরী বালিকাদের উপযোগী বিনুনি প্রস্তুত করিতেছিলেন। দশম বর্ষীয়া একটি বালিকা তাঁহার নিকটে উপবেশন করিয়া ছিল। তাহার অপূর্ব সুন্দর মুখে বয়স্কা মহিলার মুখশ্রীর সাদৃশ্য পরিস্ফুট। তাঁহাদের নিকট হইতে কিছুদূরে মাতঙ্গিনী সলজ্জভাবে ও ম্লানমুখে বসিয়া ছিল। সুকীর মা মাতঙ্গিনীকে মথুরের প্রথমা পত্নী তারার নিকটে আনিয়া নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিল এবং তিনিও সকল কথা শুনিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতঙ্গিনীকে নিজেদের পরিবারভুক্ত করিয়া লইবার পূর্বে মথুরের অনুমতি আবশ্যক। তারা সেজন্য সুকীর মায়ের দ্বারা মথুরকে অন্দরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কয়েক মিনিট পরেই মথুর তাঁহার শয়নকক্ষে আসিলেন। তখন মাতঙ্গিনী সেখান হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মাতঙ্গিনী তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিবেন, এ বিষয়ে স্বামীর সম্মতি পাইতে তারাকে বেগ পাইতে হইল না। মথুর বলিলেন, "দেবতা ও ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে

আমাদের খাওয়া-পরার অভাব নাই—আর তুমি যখন বলছ, মেয়েটি ভাল, তখন যতদিন খুশি সে এখানে থাকতে পারে।"—কিন্তু মথুরের কনিষ্ঠা পত্নী চম্পকের প্রতিকূলতায় তারার সহৃদয়তা ব্যর্থ হইল। চম্পক বয়সে তারা অপেক্ষা আট বৎসরের ছোট। চম্পক পরমা রূপসী, বড় গর্বিতা ও প্রভুত্বপরায়ণা। সর্বময়ী কর্ত্রীর ন্যায় তিনি সকলকে শাসন করিতেন। সকলে তাঁহাকে ভয় করিত। মথুর চম্পকের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। চম্পকের পছন্দ হইল না যে, তাঁহার সতীনের অনুগ্রহে কেহ তাঁহাদের বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করে।

স্বামীর সহিত দেখা হইলে চম্পক অভিমানভরে বলিলেন, "মাতঙ্গিনী যদি এখানে থাকে, তবে আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।"

মথুর কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ আবার কি?—ছেলেমানুষি ক'রো না।"

চম্পক উত্তর করিলেন, "না, ওকে তাড়াও।"

"আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি।"—বলিয়া মথুর সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। মনে করিলেন, চম্পকের মতের পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে কোন প্রকারে ভাড়াইয়া চলিবেন।···

পরদিন প্রাতে বৈঠকখানায় গিয়া মথুর দেখিলেন, রাজমোহন তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রাজমোহন বলিল, সে খবর পাইয়াছে যে, তাহার স্ত্রী সেখানে আছে। সে ঝগড়া করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে—রাজমোহন তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইতে চায়। নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া মথুর রাজমোহনের এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না।

মাতঙ্গিনীকে যখন বাড়ী ফিরিতে বলা হইল, তখন তাহার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ভাবিয়া মাতঙ্গিনীর দেহের রক্ত হিম হইয়া গেল। সুকীর মায়ের উপর মাতঙ্গিনীকে বাড়ী পৌছাইয়া দিবার ভার পড়িল।

মাতঙ্গিনী একরূপ মৃতপ্রায় অবস্থায় স্বকীয় মায়ের পিছু পিছু চলিল। তারা তাহাকে খিড়কির দরজা পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া দুঃখিত মনে বিদায় দিলেন।

১২

রাধাগঞ্জের কিছু দক্ষিণে, মধুমতীর তীরস্থিত সুদুর্গম বনের ভিতরে তৃণনির্মিত একটি কুটীর। অতি প্রত্যুষে সেখানে বসিয়া ভিখু ও সর্দার গঞ্জিকা সেবন এবং মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছিল।—

ভিখু। আচ্ছা, এ কাজে আমাদের লাভ?

সর্দার। লাভ, একটা মোটা টাকা—পূরো পাঁচ হাজার।

ভিখু আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বেড়ে!—তবে উকীলটাকে রাস্তায় ধ'রে কাজ হাসিল কর না কেন?—উইলটা নিশ্চয়ই তার সঙ্গে থাকবে।"

সর্দার। কিন্তু ঐ বেটী—ঐ রাজমোহনের বৌ যে আমাদের কথা শুনে মাধবকে সব ব'লে দিয়েছে! আর সে কি রীতিমত পাহারার ব্যবস্থা না ক'রে ঐ দলিল পাঠাবে?—আমরা তো মোটে দু'জন। তাই অন্য উপায়ে কাজ বাগাবার চেষ্টায় আছি। গায়ের জোরে কাজ না হ'লে বুদ্ধিতে কাজ হাসিল করতে হয়।

ভিখু ছিলিমে লম্বা এক টান মারিয়া ধীরে ধীরে ধুম ত্যাগ করিতে লাগিল এবং তাহা তাহার সম্মুখে কুণ্ডলী পাকাইয়া চলিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, "পাঁচ হাজারের এক হাজার কি আমরা আগাম পাব না? তা হ'লেও তো কিছু লাভের আশা থাকে। তখন এখান থেকে স'রে পড়লে কেউ আর আমাদের নাগাল পাবে না।"

সর্দার। যে টাকা দেবে তুই কি তাকে এমন বোকা ভেবেছিস্? তার সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছে শোন্। দলিলখানা আমরা পেয়েছি

দেখাতে পারলে সে এক হাজার টাকা দেবে। তাকে সেটা দিলে আর দু' হাজার। পরে মামলায় তার জিত হ'লে আমরা পাব বাকী দু' হাজার।

ভিখু। তবে উপায়? কি ফন্দি এঁটেছ বল দেখি?

এমন সময়ে বনের মধ্য হইতে কে যেন পেঁচার ডাকের অনুকরণে শব্দ করিল। সর্দারও ঠিক ঐরূপ শব্দ করিয়া তাহার উত্তর দিল এবং পরে ভিখুকে বলিল, "আর কেউ নয়, রাজমোহন আসছে।"

রাজমোহন শীঘ্রই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্দার জিজ্ঞাসা করিল, "কি রাজমোহন, খবর কি?"

রাজমোহন। খবর ভাল, আমার স্ত্রীকে ফিরে পাওয়া গেছে।

সর্দার খুশী হইয়া বলিল, "বটে, বটে? সে ছিল কোথায়?"

রাজমোহন। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! সে তার বোনের বাড়ী যায় নি, গিয়েছিল খোদ মথুর ঘোষের বাড়ী।

সর্দার। বটে? এখন সে বলছে কি?

রাজমোহন। বলছে না কিছুই।

সর্দার। যাক্ গে, ওকে শেষ ক'রে ফেলতে হবে।

রাজমোহন। একটু ভেবে দেখ সর্দার, ওকে রেহাই দিতে পারা যায় কিনা। আমরা যা ভয় করেছিলাম, তা সে করে নি—সে মাধব ঘোষের বাড়ীতেও যায় নি, বা কালকের রাত্রের ব্যাপার নিয়ে কোন শোরগোলও করে নি। যদি আজ সে তা না ক'রে থাকে, তবে কালই বা করবে কেন?"

সর্দার একটু ভাবিয়া বলিল, "বেশ, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে চল, আমাদের সঙ্গে মিৎগুন্টিতে বাস করবে।"

রাজমোহন। ডাকাত হ'য়ে থাকতে হবে নাকি?

সর্দার। হাঁ।—তুমি কি ডাকাত নও?

রাজ। কাজে হয়তো তাই, কিন্তু নামেডাকে ডাকাত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

সর্দার। তবে তুমি সেখানে যাবে না?

রাজ। না, এই হতভাগী স্ত্রী ছাড়াও আমার বাড়ীতে আরো লোক আছে। সে-সকলকে নিয়ে আমার কি ডাকাত হওয়া চলে?

সর্দার। আমাদের পরিবারের লোকেরা সেখানে থাকছে নাকি?

অনেকক্ষণ এইরূপ বাদানুবাদ চলিল। শেষ পর্যন্ত সর্দারের ভীতিপ্রদর্শনে কিছুটা বিচলিত হইয়া রাজমোহন তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

তখনও দুপুর হয় নাই—রাজমোহন স্নানাহারের জন্য বাড়ী ফিরিল। সেখানে প্রথমে তাহার ভগ্নী কিশোরীর সহিত দেখা হইল। রাজমোহন তাহাকে বলিল, "কিশোরী, হতভাগীটাকে আমার কাছে আসতে বল্। আবার আমার বাড়ী থেকে কি ক'রে পালাতে হবে, তা তাকে শিখিয়ে দিচ্ছি।"

কিশোরী বলিল, "দাদা, তুমি কার কথা বলছ?"

ইহাতে বিরক্ত হইয়া রাজমোহন চীৎকার করিয়া বলিল, "কেন, তোর বৌদির কথা।"

কিশোরী উত্তর করিল, "তুমি তো জানই—বৌদি বাড়ীতে নেই।"

রাজমোহন আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, "বাড়ীতে নেই!—কেন, সেকি সকালে বাড়ী ফেরে নি?"

কিশোরী বলিল, "তুমি বলেছিলে যে, বড়বাড়ী থেকে তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে—কিন্তু তুমি তো তা পাঠাওনি।"

ক্রোধ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রাজমোহন চীৎকার করিয়া উঠিল, "মিথ্যা কথা! আমি তাকে সুকীর মায়ের সঙ্গে আসতে দেখেছি।"

কিশোরী বলিল, "আশ্চর্য! কিন্তু সে বাড়ী ফেরে নি।"

রাজমোহন বাঘের মত ছুটিয়া বাড়ীর চারিপাশে তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও মাতঙ্গিনীকে দেখিতে পাইল না।

১৩

তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, অন্ধকার। মাধবের কক্ষের উজ্জ্বল আলো বহুদূর হইতে দেখা যাইতেছিল। মাধব একাকী কৌচে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। মাধবের হাতে একখানা ইংরেজী বই, কিন্তু তিনি তাহা বড় পড়িতেছিলেন না। মুক্ত বাতায়ন-পথে তারকাখচিত অন্ধকার আকাশের যেটুকু তাঁহার নয়নগোচর হইতেছিল, তিনি সেইদিকে উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার চিন্তাতুর মন নানা বিষয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মোকদ্দমার অনিশ্চিত ফলাফলের বিষয়ে তাঁহার নানারূপ আশঙ্কা হইতেছিল। ভবিষ্যতে তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে? না জানি মাতঙ্গিনীর অদৃষ্টেই বা কি আছে! তাঁহার মথুর ঘোষের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ, সেখান হইতে প্রত্যাগমন এবং হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ার খবর তিনি পাইয়াছিলেন। মাতঙ্গিনীর ন্যায় সাহসী স্ত্রীলোক যে সামান্য কারণে গৃহত্যাগ করে নাই, ইহা মাধব বেশই জানিতেন। কিন্তু কারণটি যে কি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। সহসা অদ্ভুতভাবে অন্তর্ধানের হেতু আরও কম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার যে কিছু বিপদ ঘটিয়াছে, তাহা মাধব নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি দারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। নানা চিন্তায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তিনি বহুক্ষণ সেই অবস্থায় কাটাইলেন। পরে চিন্তা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি আসন ত্যাগ করিয়া বারান্দায় স্নিগ্ধ বাতাসে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া তিনি নক্ষত্রখচিত সুনীল আকাশের এবং অনতিদূরস্থিত দীর্ঘ দেবদারুশ্রেণীর দিকে তাকাইয়া থাকিতে

থাকিতে সহসা একটি অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটি দেবদারুগাছের কাণ্ডসংলগ্ন কি যেন একটা বস্তু এতক্ষণ তাঁহার নজরে পড়িতেছিল, তাহা যেন হঠাৎ অন্তর্হিত হইল। ইহা মাধবের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইল। অতি অল্পকাল পরে তিনি দেখিতে পাইলেন, অদৃশ্য বস্তুটি আবার স্বস্থানে ফিরিয়াছে। ইহাতে তাঁহার কিছু কৌতূহলের উদ্রেক হইল এবং তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগের সহিত ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। উহা আকারে অনেকটা মানুষের মস্তকের ন্যায় বলিয়া বোধ হইল। মাধবের কৌতূহল এমন বাড়িয়া গেল যে, তাঁহার নিকটে যাইয়া উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ একখানা তরবারি লইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। সদর দরজার নিকটে আসিয়া তিনি অদূরস্থিত সেই দেবদারু-গাছটির দিকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু সেখানে তেমন কিছু তাঁহার নজরে পড়িল না। তখন তিনি অগ্রসর হইয়া গাছটির কাছে গেলেন। কিন্তু সেখানে যাইতে না যাইতেই পেচকের সুতীব্র কণ্ঠস্বরের ন্যায় একটা শব্দে তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাঁহার হাতে দারুণ আঘাত করিয়া সজোরে তরবারিখানা কাড়িয়া লইল। এই হঠাৎ আক্রমণকারী কে, মাধব পিছন ফিরিয়া তাহা দেখিবার পূর্বেই একখানা সবল হাতের বৃহৎ ও কর্কশ পাতা আসিয়া তাঁহার মুখ রুদ্ধ করিল। ঠিক সেই সময়ে একজন দীর্ঘকায়, ভীষণদর্শন, শক্তিমান পুরুষ গাছ হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। মাধবের তরবারি যে ছিনাইয়া লইয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ ব্যক্তি চুপি চুপি বলিল, "এ যে অভাব্য!—বাঁধ্, বাঁধ্, বেঁধে ফেল্! আগে ওর মুখ আটকা!"

অপর ব্যক্তি তখন একখানা গামছা ও কিছুটা দড়ি তাহার কোমর হইতে লইয়া, গামছাদ্বারা মাধবের মুখ বন্ধ করিল এবং দড়ি দিয়া তাঁহার

হাত-পা বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। আর যে লোকটি গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, সে মাধবকে চাপিয়া ধরিয়া রহিল। মাধব দেখিলেন, ধস্তাধস্তি করা বৃথা—চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবারও উপায় নাই—সুতরাং তিনি নীরবে আত্মসমর্পণ করিলেন। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার মৃদুস্বরে মাধবের বন্ধনকারীকে বলিল, "এখন একে পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে চল্—সে তুই একলাই পারবি।"

এইরূপে তাহারা মাধবকে লইয়া প্রস্থান করিল। মাধবের বাড়ীর কেহই ইহার কিছু টের পাইল না।…

এদিকে মথুর ঘোষ তখন তারার কক্ষে একখানা কৌচে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। তারা নিকটে বসিয়া পাখার বাতাসে স্বামীকে ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু মথুরের ঘুম আসিতেছিল না। তিনি নীরবে চক্ষু বুজিয়া থাকিলেও মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। তারা স্বামীর এই অস্থিরতা ও উদ্বেগের কারণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি তো ঘুমুচ্ছ না!"

মথুর। না, ঘুম পাচ্ছে না—এটা আমার ঘুমের সময়ও নয়।

তারা। তবে ঘুমুতে এলে কেন? দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি মনে সুখ পাচ্ছ না। বলবে, কেন?

মথুর চমকিয়া উঠিলেন—কিন্তু তখনই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "সে কথা তোমাকে কে বললে—আমার দুঃখ কিসের?"

তারা স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আমাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা ক'রো না। তুমি সমস্ত সংসারকে ফাঁকি দিতে পারবে, কিন্তু আমাকে পারবে না।"

মথুর। পাগল!—তোমার মাথায় এ কথা এলো কি ক'রে?

তারা। তোমাকে দেখেই। শোন—গত তিন দিন ধ'রে সকলের আগে আমার চোখে পড়েছে যে, তোমার আর সে আগের ভাব নাই—

তুমি যেন কেমন হ'য়ে গেছ। তার উপর তোমার এই দীর্ঘনিশ্বাস। না, তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পার না যে, তোমার মনে সুখ নাই।

মথুর কোন উত্তর দিলেন না'।

তখন তারা আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমাকে ফাঁকি দিও না, আমার কাছে কিছু গোপন ক'রো না, আমাকে সব খুলে বল। আমার প্রাণ দিয়েও যদি তোমাকে সুখী করতে পারি, তা ক'রব।"—অশ্রুতে তাঁহার কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল।

তারার ব্যাকুলতা মথুরের হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি তখন অপরাধ স্বীকারের ভাবে বলিলেন, "আমার মনে যে সুখ নাই তা' তোমার কাছে আর গোপন করা বৃথা তারা! কিন্তু আমার অশান্তির কারণ তোমাকে খুলে বলতে পারছি না ব'লে তুমি দুঃখিত হ'য়ো না। সে কথা কাউকে বলা চলে না।"

স্বামীর কথায় তারার মুখে ক্ষণেকের জন্য গভীর যন্ত্রণার রেখা ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তখনই তিনি নিজকে সামলাইয়া লইলেন এবং ধীরস্থির ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "তবে আমার একটা সামান্য অনুরোধ রাখবে বল—আমাকে কথা দাও।" ঠিক এই সময়ে অনতিদূরে পেচকের বিকট কণ্ঠস্বরের ন্যায় একটা তীব্র শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। তাহা শুনিয়া মথুর সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তারা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অমন চমকালে কেন? শব্দটা শুনলে ভয় হয় বটে, কিন্তু ও তো পেঁচার ডাক।"

আবার ভীষণ শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিল। তারা কিছু বলিবার পূর্বেই মথুর সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তারা বিস্মিত হইলেন। তাঁহার যেন কেমন কৌতূহল হইল এবং তিনিও কক্ষের বাহিরে আসিলেন। স্বামী নীচে গিয়াছেন বুঝিয়া তারা

ছাদের সিঁড়ি দিয়া উপরে গিয়া স্বামীর ঐরূপ চমকিত হইবার কারণ বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেদিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল, সেদিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে তিনি কক্ষে ফিরিবেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, কে যেন তাঁহাদের খিড়কির দরজা দিয়া বাহিরে যাইতেছে। পুনরায় দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, মানুষটি তাঁহার স্বামী। তারা দেখিলেন, মথুর দ্রুতপদে জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি যেন মূর্ছিত হইবার মত হইলেন। সহস্র আশঙ্কায় ও সন্দেহে তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি ছাদের আলিসার উপর ভর দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে স্বামীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সহসা স্বামীকে আর দেখিতে পাইলেন না। তথাপি তিনি বহুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া স্বামীর খোঁজে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে হতাশ হইয়া স্বামীর সন্ধান ছাড়িয়া দিবেন, এমন সময় হঠাৎ আবার স্বামীকে দেখিতে পাইলেন। মথুর গুদামমহলের ক্ষুদ্র লৌহদ্বার দিয়া বাহির হইতেছিলেন। মথুর নিজ গৃহেই আছেন দেখিয়া তারা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভয় সম্পূর্ণ দূর হইল না। তাঁহার মন যেন কি এক অজানা আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ আবার স্বামীকে দেখিতে পাইলেন না। অর্ধঘণ্টার উপর কাটিয়া গেল, কিন্তু মথুর সেই গুপ্তদ্বার দিয়া ফিরিলেন না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া তারা অবশেষে নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

হঠাৎ একটি কথা তাঁহার মনের উপর খেলিয়া গেল। এই ব্যাপারের সঙ্গে স্বামীর গোপন কথার কোন যোগ নাই তো? তখন তারা কি করিবেন সে বিষয়ে মনঃস্থির করিলেন।

অল্পকাল পরে মথুর কক্ষে ফিরিলেন। তিনি যেন কিছু অস্থির ও চঞ্চল, কিন্তু তাঁহার চোখে যেন কি একটা ভাবের উল্লাস। তারা যাহা দেখিয়াছেন, কিছুই বলিলেন না।

১৪

একখানা ছোট, নীচু ঘর। তাহার প্রাচীর খুব স্থূল এবং লোহার খুব পুরু ও ছোট একটি দরজা। ঘরে একটি প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। সেই স্বল্পালোকে ঘরখানাকে আরো ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছে—দেখিলে মনে হয়, যেন মানুষকে জীবন্ত কবর দিবার জন্যই উহা তৈরি করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত দরজাটি ছাড়া ঘরের এক কোণে আর একটি অতি ক্ষুদ্র দরজা আছে। তাহা এত ছোট যে, একটি শিশু কোনরূপে হামাগুড়ি দিয়া সেই পথে চলিতে পারে। এই দরজাটি দিয়া বোধ হয় পাশের কোন ঘরে যাওয়া যায়। ঘরখানাতে কোনরূপ আসবাবপত্র নাই—তাহা সম্পূর্ণ খালি। গভীর নিশীথে একটি লোক এই ঘরে পায়চারি করিতেছেন। তিনি মাধব ঘোষ। মাধবকে সেখানে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ বা হতাশ হন নাই। তিনি স্থির করিলেন যে, দুর্বৃত্তদের হস্তে চূড়ান্ত লাঞ্ছনাকেও অগ্রাহ্য করিবেন।

কিছুকাল পরে দরজার বাহিরে তালা খুলিবার শব্দ হইল। যে দুই ব্যক্তি মাধবকে সেখানে আটক করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া আবার সাবধানে দরজা বন্ধ করিল। মাধব অপরিসীম ঘৃণা ও ক্রোধভরে একবার তাহাদের দিকে তাকাইয়া আবার পূর্বের ন্যায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। সর্দার ও ভিখু প্রদীপের কাছে বসিল। ভিখু তাহার কোমর হইতে গাঁজা ও কলিকা বাহির করিয়া গাঁজা খাইবার আয়োজনে ব্যস্ত হইল। সর্দার আলোটি উস্কাইয়া

দিতে দিতে মাধবকে একটু ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "বাবুকে আজ তো বেশ ঠাণ্ডা দেখছি।"

মাধব থামিয়া সেই দুরাত্মার মুখের পানে তাকাইলেন—বোধ হইল, তিনি কিছু উত্তর দিবেন। কিন্তু তিনি তাহা না দিয়া, হঠাৎ পিছন ফিরিয়া আবার আগের মত পায়চারি করিতে লাগিলেন। ততক্ষণে গাঁজা সাজা হইয়াছে এবং দস্যুরা তাহাতে আগুন দিয়া টানিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু মাধবের নীরব তাচ্ছিল্যে তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তখন সর্দার একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া মাধবকে বলিল, "বাবু কি দয়া ক'রে কলকেতে একটা টান দিয়ে দেখবেন? শপথ ক'রে বলতে পারি—গাঁজা যা তৈরি হয়েছে তাতে লাখপতিরও বেশ ভালই লাগবে।" এবারও মাধব কোন উত্তর দিলেন না। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সর্দার গাঁজা টানিতে টানিতে তাহার সঙ্গীর সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

অবশেষে মাধব সর্দারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার প্রভু আমাকে নিয়ে কি করতে চান, বল দেখি?"

"আমাদের কোন প্রভু নাই"—রুক্ষভাবে এই জবাব দিয়া সর্দার আবার গঞ্জিকা সেবনে ও আলাপে রত হইল।

মাধব বলিলেন, "আরে, তোমাদের এ কাজে যে লাগিয়েছে তার কথা বলছি।"

"আমাদের কেউ এ কাজে লাগায় নি"—পূর্বের মত রুক্ষস্বরে এই উত্তর দিয়া সর্দার আবার গাঁজা টানিতে লাগিল।

মাধব। কেউ লাগায় নাই?—তবে কি আমাকে তোমরা মিছামিছি এখানে আটকে রেখেছ?

সর্দার। মিছামিছি নয়। আমরা টাকার জন্যে আপনাকে আটকে রেখেছি।

এই সময়ে একটা আর্তনাদের মত শব্দে তাহাদের কথায় বাধা পড়িল। তিনজনই বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। তার পর সর্দার বলিল, "এখানে আর কেউ আছে নাকি? দেখতে হচ্ছে।"

প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে ঘরের সকল স্থান মোটামুটি দেখা যাইতেছিল। তথাপি সর্দার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘরের সকল কোণ ভাল করিয়া দেখিল—কিন্তু নূতন কিছুই তাহার নজরে পড়িল না। তখন সে বলিল, "তাজ্জব ব্যাপার!—যাক্ গে ছাই। মশাই বলছিলেন, কে একজন আমাদের এ কাজে লাগিয়েছে; কে সে বলুন তো?"

মাধব সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "মথুর ঘোষ—বল দেখি, তিনি কি হুকুম দিয়েছেন?"

সর্দার মাধবের প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। কিন্তু গাঁজার নেশায় উত্তেজিত ভিখু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; সে বলিয়া উঠিল, "সত্যি বলতে কি—আমাদের দরকার টাকার, আমরা এ মানুষটাকে নিয়ে কি ক'রব?"

সর্দার বলিল, "একে খেয়ে ফেল্!"

তাহার রসিকতায় ভিখু রুক্ষস্বরে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু আবার সেই আর্তনাদে তাহার হাসি হঠাৎ থামিয়া গেল। এবার যেন ছাদ হইতে আওয়াজ আসিতেছিল। সর্দারও চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "আবার!" ভিখু ভয়ে ভয়ে ফিসফিস করিয়া বলিল, "জায়গাটা বহুদিন খালি ছিল, কে জানে কেউ এসে এখানে বাসা নিয়েছেন কিনা!"

সর্দার অনেকটা বেশী সাহসী, সুতরাং সে তত সহজে ভীত হইল না। সে বলিল, "হয়তো কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে, আমি দেখে আসি। ভিখু, তুই বাবুর উপর নজর রাখিস্।"

এই বলিয়া সর্দার তাহার পরনের ছোট কাপড়খানার একধার হইতে কিছুটা ছিঁড়িয়া তাহাতে একটি সলিতা পাকাইল এবং তাহা

প্রদীপের তেলে ভিজাইয়া ও জ্বালিয়া সাবধানে দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিল।—পাশাপাশি তিনটি ঘর। তাহার মাঝেরটিতে মাধবকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। ঘরগুলির সামনে একটি বারান্দা। তার পর প্রাচীরে ঘেরা একটু খোলা জায়গা। সর্দার বারান্দা ও খোলা জায়গা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও তেমন কিছু দেখিতে পাইল না। সে বিরক্ত ও সন্দিগ্ধচিত্তে আবার ঘরে ঢুকিল। ভিখু তখন খুব ভীত হইয়া উঠিয়াছে। সেখান হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সে সর্দারের কনুইতে জোরে একটি চিমটি কাটিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি কথাবার্তা শেষ করিবার ইঙ্গিত করিল।

সর্দার তখন মাধবকে বলিল, "বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে বাবু—আমাদের শর্তে রাজী হ'লেই আপনি মুক্ত হ'তে পারেন।"

সুযোগ বুঝিয়া মাধব তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন, "কি শর্ত ?"

সর্দার। আপনার খুড়ার উইলটা আমাদের দিন।

"সেটা এখানে আমার কাছে নাই"—মাধব সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়া, পিছন ফিরিয়া আবার পায়চারি করিতে লাগিলেন।

সর্দার। তা হ'লে এখানেই থাকুন, আমরা চাবি নিয়ে চললাম।

মাধব। আচ্ছা ধর, দলিলটা আমি দিতেই চাই, কিন্তু সেটা আমি এখানে থেকে পাব কি ক'রে ?

সর্দার। আপনার অবস্থায় পড়লে আমি, যারা আমাকে আটক করেছে, তাদের একজনের মারফতে বাড়ীতে চিঠি লিখে তার হাতে দলিলটা আমাকে পাঠিয়ে দিতে বলতাম।

মাধব। যদি আমার বাড়ীর লোকে জিজ্ঞেস করে, আমি কোথা থেকে চিঠি লিখছি, কি উত্তর দিবে ?

আবার সেই ভৌতিক শব্দ তাহাদের কানে আসিল। এবার একটা অস্বাভাবিক ও মৃদু চীৎকার। এবারও বোধ হইল ছাদ হইতে শব্দটা

আসিতেছে। দস্যুরা ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। মাধবও বিচলিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর উপরে কি কোন ঘর আছে?"

দুইজন দস্যুই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "না, না।"

তার পর সর্দার বলিল, "দাঁড়াও, আমি আবার ছাদে গিয়ে দেখছি।"

সেই অনতিউচ্চ ঘরগুলির ছাদে উঠিয়া এবারও সর্দার কিছু দেখিতে পাইল না। বিরক্ত ও চিন্তাকুল মনে সে আবার ঘরে ফিরিল।

হঠাৎ মাধবের একটা কথা মনে পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ঘরের পাশে এ রকম আরো দুটো ঘর আছে, না? তোমরা কি আর কাউকে ধ'রে এনে সেখানে আটকে রেখেছ?"

সর্দার। না।

মাধব। তবে হয়তো আর কেউ এনেছে। এ পাপিষ্ঠের হাতে প'ড়ে কোন হতভাগা হয়তো ওখানে চরম দুর্দশা ভোগ করছে। গিয়ে দেখতে পার, কেউ সেখানে আছে কিনা?

সর্দার একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনি ঠিকই বলেছেন।" তার পর সে আবার একটি সলিতা পাকাইয়া তাহা জ্বালিয়া সেই ঘরগুলি খুঁজিয়া দেখিতে চলিল। সেখানে গিয়া দেখিল, ঘর দুইটির দরজা খোলা—তাহা সম্পূর্ণ খালি পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

মাধবও যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। সর্দারের তখন সেখানে অপদেবতার বাসের সম্বন্ধে আর বিশেষ সন্দেহ নাই। ভীতিবিহ্বল ভিখু সর্দারের কাছে ঘেঁষিয়া আসিল।

সর্দার মাধবকে বলিল, "দেবতাদের চালচলন দেবতারাই জানেন। আমাদের আর এখানে থাকতে সাহস হচ্ছে না। আপনি কি বলবেন শীগগির বলুন, নইলে আপনাকে আটকে রেখেই আমরা চললাম।"

মাধব দেখিলেন, তাহাদের শর্তে রাজী হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। তাহাদের কথামত চিঠি দিলে, হয়তো তাহা দৃষ্টে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা অনুসন্ধানে এই কয়েদখানার খোঁজ পাইতে পারেন। তথাপি তিনি একবার শেষচেষ্টা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি সর্দারকে বলিলেন, "উইলটা হাত করতে পারলে তোমরা কিছু টাকা পাবে। বল কত পাবে, আমি তার দ্বিগুণ দিব—তোমরা উইলের বদলে টাকা নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।"

সর্দার। না, তাতে আমাদের কাজ নাই। একবার ছাড়া পেলে আপনি যা টাকা দিবেন, তা আমরা জানি। চিঠি দিতে হয় দিন, নইলে আমরা চ'লে যাচ্ছি।

হঠাৎ ঘরের ভিতর কোথায় যেন কাপড়ের খসখস শব্দ হইল। দস্যুরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া যেন পলাইবার মতলব করিল। মাধব তাহাদের চাহনির মর্ম বুঝিয়া কাগজ-কলম চাহিলেন। তাহারা কাগজ-কলম লইয়া আসিয়াছিল—মাধবকে তাহা দিল। মাধব তাঁহার বাড়ীর প্রধান আমলার কাছে চিঠি লিখিতে লাগিলেন।

এই সময় শিকলের গভীর ঝনঝন শব্দ ও একটা তীব্র খটখট আওয়াজ সেই ভীত চকিত দলের কানে যেন বজ্রাঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই অপার্থিব আর্তনাদ—আরো উচ্চ, আরো তীব্র। ভিখু এক লাফে বারান্দা পার হইয়া চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। সচকিত সর্দারও লাফ দিয়া বারান্দায় পড়িল। সেখানে সে যাহা দেখিল, তাহাতে যারপরনাই ভীত হইয়া ঘরের দরজায় তালা না দিয়াই সে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া পলাইল। মাধব সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেন।

মাধব কিছুকাল স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু শীঘ্রই সাহস সঞ্চয় করিয়া তিনিও বারান্দায় আসিলেন। প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরে

দেখিলেন, বারান্দার একটি ছিদ্র দিয়া উঠান হইতে একটি সূক্ষ্ম আলোকরেখা আসিতেছে। সে-দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিলেন, দরজা খোলা রহিয়াছে এবং সেই নির্জন স্থানে একজন স্ত্রীলোক দাড়াইয়া আছে। মাটির উপর একটি ছোট লণ্ঠন। তাহা তুলিয়া লইয়া ভালরূপ দেখিতে গিয়া মাধব যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তারা!"

বিস্ময়ে নির্বাক তারাও মৃদুস্বরে বলিলেন, 'মাধব!"

এই সময় উপর হইতে আবার সেই কাতরধ্বনি কানে আসিল।

১৫

মাধব ও তারা বাল্যকাল হইতেই পরস্পরের পরিচিত। তারার পিতা ও মাধবের মাতামহ একই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একটা দূর সম্পর্কও ছিল। শৈশবে মাধব যখন প্রায়ই সেখানে যাইতেন, তখন তারা মাধবের খেলার সাথী হইতেন। তারা মাধবের চেয়ে বয়সে কিছু বড় হইলেও উভয়ে উভয়ের নাম ধরিয়া ডাকিতেন। এইরূপ অবাধ মেলামেশায় তাঁহাদের মধ্যে ভ্রাতাভগ্নী-সুলভ যে প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, মথুরের সহিত তারার বিবাহের পরও তাহা অটুট ছিল। কিন্তু মাধবের খুড়ীর সহিত তাঁহার মোকদ্দমায় মথুর বিষয়লোভে গোপনে খুড়ীকে সাহায্য করায় দুই জ্ঞাতিভ্রাতার মধ্যে মনোমালিন্যের সঞ্চার হয়। মথুরের এই কার্যকলাপের বিষয় জানিতে পারিবার পর হইতে মাধব আর তাঁহার গৃহে যাইতেন না।...

গুদাম-মহলে হঠাৎ মাধব ও তারার দেখা হওয়ায় উভয়েই খুব বিস্মিত হইলেন। কিছুকাল কেহই কোন কথা বলিতে পারিলেন না। পরে তারা বলিলেন, "মাধব, তুমি এখানে?"

মাধব উত্তরে তারাকে ঐরূপ কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না এবং

তাঁহার প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তারা ব্যাপারটি পরিষ্কার করিবার জন্য আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরপো, প্রথমে বল দেখি, যমদূতের মত যে দুটো লোক এখনই এখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, ওরা কে? ও-রকম লোকের সঙ্গে তোমার কি কাজ থাকতে পারে, তাও আবার এখানে আমাদের বাড়ীতে, তা ভেবে আমি বিস্মিত হচ্ছি। আমি যখন ওখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন ওদের মধ্যে একজন আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল এবং বোধ হয় আমাকে পেত্নী ভেবেই খুব তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।"

মাধব। তা হ'লে তুমিই দরজাটা খুলতে শিকলের শব্দ করেছিলে?

তারা। হাঁ, দরজা আমিই খুলেছি—দরজা খুলে তুমি যে ঘর থেকে বেরুলে তার দিকে যাচ্ছি, এমন সময় এই দুটো যমদূতকে দেখে ভয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম।

মাধব। কিন্তু ঐ শব্দ আসছিল কোথা থেকে?

তারা। কোন্ শব্দ?

মাধব। তুমি কি কোন অদ্ভুত শব্দ শোন নি?

তারা। হাঁ শুনেছি—একটা আর্তনাদ, যা শুনলে শরীরের রক্ত জ'মে যায়। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, সেটা তোমার ঘর থেকেই আসছে।

মাধব। না।

তারা। না?—তুমি অমন ক'রে ভয় দেখালে আমি ফিরে যাব।

মাধব। আমি কেন এখানে এসেছি, তা না শুনেই ফিরে যাবে?

তারা। তা অবশ্য শুনব—আর আমি কেন এখানে এসেছি, তাও বলব। শীগগির বল।

মাধব। কিন্তু তার আগে একটু সাবধান হওয়া দরকার।

এই বলিয়া মাধব বাহিরে গেলেন এবং গুদাম-মহল হইতে বাড়ীর বাহিরে যাইবার দরজায় ভারী হুড়কাটি আটকাইয়া দিলেন। তার পর তারাকে লইয়া কয়েদঘরে গিয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিলেন। তাহা শুনিয়া তারা যারপরনাই দুঃখিতা হইলেন।

অবশেষে তারা বলিলেন, "তা হ'লে আমি যা খুঁজছি তুমি তা নও। তুমি সবে আজ সন্ধ্যায় এখানে এসেছ, কিন্তু যে সন্দেহে আমি এখানে এসেছি তা দু'দিন আগে আমার মনে জেগেছে।"

তার পর তারা কেন তিনি সেখানে আসিয়াছেন তাহা মাধবকে বলিলেন।—স্বামীকে চিন্তাকুল দেখিয়া তারা নানা কল্পনায় বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। পীড়াপীড়ি করিয়াও স্বামীর নিকট হইতে কিছু জানিতে পারেন নাই। পরে সেদিন রাত্রে স্বামীকে গোপনে গুদামের দিকে যাইতে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়। তিনি কোন রকমে গুদামে ঢুকিয়া সেখানকার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পরে ঘুমন্ত স্বামীর বালিশের নীচ হইতে চাবি লইয়া তারা সেখানে আসিয়াছেন।

তারা বলিতে লাগিলেন—"মাধব, তোমাকে দেখে আমি ভেবেছিলাম যে, তোমার এখানে থাকার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার স্বামীর দুঃখের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এখন দেখছি তোমার সঙ্গে আমার সন্ধানের কোন যোগ নাই।"

মাধব বলিলেন, "তোমাকে বোধ হয় নিরাশ হ'তে হবে না—ঐ-যে শব্দ—তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না? এখনও রহস্যের মীমাংসা হয়নি।"

তারা ভয়ে ফেকাশে হইয়া গেলেন।

মাধব বলিলেন, "ভয় পেও না—আমি সব তোমাকে বলছি।"

তারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "বল।"

মাধব তখন ডাকাতদের সহিত কথাবার্তার সময় যে অদ্ভুত শব্দ শুনিতে

পাইয়াছিলেন, তাহার বিষয় যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বর্ণনা করিলেন, যেন তারা উহাকে ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া না ভাবেন।

তারা যারপরনাই মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে ভূতের ভয় ও কৌতূহল—দুই-ই ছিল। স্বামীর দুশ্চিন্তার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাঁহাকে যে এইরূপ ভয়ানক অবস্থায় পড়িতে হইল, তাহাতে তারার দুঃখের অবধি ছিল না। নিজের কাজের জন্য তাঁহার কিছু অনুতাপও হইতেছিল। তিনি তাঁহাকে অন্তঃপুরে দিয়া আসিবার জন্য মাধবকে অনুরোধ করিলেন।

মাধব কিছুটা উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এত সহজেই তোমার অনুসন্ধান ছেড়ে দেবে? আমি তোমাকে সত্যি ক'রে বলছি, এতে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।"

তারা কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। পরে চিত্ত স্থির করিয়া বলিলেন, "কিন্তু খুঁজব কোথায়? ডাকাতরা কি সব জায়গা খুঁজে দেখে নি?"

মাধব। হাঁ দেখেছে; কিন্তু ঐ-যে লোহার ছোট দরজাটা রয়েছে, ওটা তারা খুলে দেখে নি।

এই সময় আবার সেই অস্বাভাবিক আর্তনাদ শুনিতে পাওয়া গেল। এবার তাহা আরো স্পষ্ট। তারা ও মাধব উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। হঠাৎ একটা রহস্যময় ও বেদনাদায়ক চিন্তা মাধবকে আকুল করিয়া তুলিল। তারার হাত হইতে একরূপ সজোরে চাবির গোছা কাড়িয়া লইয়া মাধব পাগলের মত এক লাফে সেই ছোট দরজাটির নিকটে আসিলেন এবং হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তালায় একটি চাবি ঢুকাইয়া দিলেন। কিন্তু চাবি ঘুরিল না। সেইরূপ উত্তেজিত ভাবে তিনি পর পর আরো দুইটি চাবি দিয়া তালাটি খুলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইলেন না। পরে আর একটি চাবি তালায় লাগাইয়া তাহা ঘুরাইতেই সেই ভারী দরজাটি সবেগে খুলিয়া গেল। "তারা, তারা, ইতস্তত না ক'রে

আমার পিছনে পিছনে এস”—চীৎকার করিয়া এই কথা বলিয়া মাধব সেই পথে ভিতরে ঢুকিলেন। তারাও তখন উত্তেজনাভরে লণ্ঠনটি লইয়া মাধবের অনুসরণ করিলেন। শীঘ্রই তাঁহারা তাঁহাদের সম্মুখে একটি সরু ও খাড়া সিঁড়ি দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সবিস্ময়ে সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলেন, একটি ছোট দরজা—আপাতদৃষ্টিতে তাহাকে উপরের তলার কোন ঘরের দরজা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে দোতলা নয়, একটি চোরা কুঠরি মাত্র।

মাধব শশব্যস্তে সেই কুঠরির তালা খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পর পর দুই-তিনটি চাবি ব্যবহারেও তালা খুলিতে পারিলেন না—খুব জোর দিয়া চাবি ঘুরাইতে চেষ্টা করায় তাঁহার হাতের আঙ্গুল কাটিয়া রক্ত বাহির হইল। তার পর একটি চাবি কলে ঘুরাইতে চেষ্টা করিতেই লোহার পাতে মোড়া দরজাটি সশব্দে খুলিয়া গেল। মাধব কুঠরিতে ঢুকিলেন। লণ্ঠন হাতে তারাও মাধবের অনুসরণ করিয়া সেখানে প্রবেশ করিলেন। প্রদীপের মৃদু আলোকে তাঁহারা একটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। বার্নিস করা মেহগনি কাঠের ছোট একখানা খাট—ক্রেপ ইত্যাদি অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রে সুসজ্জিত। সেই খাটের উপর যেন একজন স্ত্রীলোক শয়ন করিয়া আছে। তারা ও মাধব ছুটিয়া খাটের কাছে গেলেন। তারা খাটের উপর প্রদীপটি তুলিয়া ধরিতেই তাহার অস্পষ্ট আলোকে মাতঙ্গিনীর মূর্তি তাঁহাদের নজরে পড়িল—বিবর্ণ, কৃশ, ব্যথাতুর, কিন্তু তখনও অপরূপ সুন্দর।

১৬

তারা ও মাধব মাতঙ্গিনীকে বাড়ীর একটি নির্জন কক্ষে বহিয়া লইয়া গেলেন। তারার যত্নে ও মুক্ত বায়ুর স্পর্শে শীঘ্রই মাতঙ্গিনীর মুখে পুনরায় রক্তসঞ্চার হইল এবং সূর্যোদয়ের অনেক পূর্বেই সে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ

করিল। তার পর তাহাকে পথ্যাদি দেওয়া হইলে সে আরও সজীব হইয়া উঠিল। তখন সে কিরূপে জীবন্ত কবরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সে কাহিনী ধীরে ধীরে তারাকে বলিল। তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

মথুর ঘোষ যখন সুকীর মায়ের সঙ্গে মাতঙ্গিনীকে তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইলেন, তখন মাতঙ্গিনী বুঝিতেই পারে নাই যে, সেই ধূর্ত রাক্ষস তাহার জন্য কি ফাঁদ পাতিয়াছে। সুকীর মা পথে মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, স্বামীর নিকটে ফিরিতে তাহার ভয় করিতেছে কিনা।

মাতঙ্গিনী বলিল, "সত্যি কথা বলতে কি, সুকীর মা, পৃথিবীতে আমার থাকার মত অন্য জায়গা থাকলে আমি স্বামীর ঘরে যেতাম না।"

সুকীর মা। তাই নাকি? আমি বোধ হয় তোমাকে বাঁচাতে পারি। আমি তোমাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবো, যেখান থেকে আর কেউ তোমাকে খুঁজে বের করতে পারবে না।

মাতঙ্গিনী। না, তা হ'লে মন্দ লোকে মন্দ বলবে।

সুকীর মা। তবে তোমার বোনের বাড়ীতে চল না কেন?

মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, তাও যেতে পারি না।"

ধূর্তা সুকীর মা যেন অসহায়া মাতঙ্গিনীর প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতিশীলা এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিল, "তা হ'লে চল তোমার বাপের বাড়ী যাই।"

মাতঙ্গিনী। কিন্তু তার খরচ পাব কোথায়?

সুকীর মা। তা হবে এখন—তুমি বাপের বাড়ী যেতে চাইছ জানলে, বড় গিন্নী অবিশ্যি তোমার যাবার জন্য নৌকা ঠিক ক'রে দেবেন, আর আমি তোমাকে সেখানে রেখে আসব।

মাতঙ্গিনী। বেশ, তাই চল।

সুকীর মা। তবে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমাকে যেখানে

রেখে যাই, তুমি সেখানে থাক। সেখানে তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না। চল যাই।

তখন মাতঙ্গিনী সেই শয়তানীর সঙ্গে গেল। সে তাহাকে গুদাম-মহলের চোরা কুঠরীতে লইয়া গেল। সেখানে ঢুকিয়া, তাহার অপূর্ব সাজসজ্জা দেখিয়া মাতঙ্গিনী অত্যন্ত বিস্মিত হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সুকীর মাকে প্রশ্ন করিবে ভাবিয়া পিছন ফিরিল। দেখিল, সুকীর মা ইহার মধ্যে বাহির হইতে দরজা আটকাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

বুদ্ধিমতী মাতঙ্গিনী তখন সবই বুঝিতে পারিল এবং দ্রুত নিজের কর্তব্য স্থির করিল।

সন্ধ্যাবেলা মথুর ঘোষ সেখানে আসিলেন। তিনি বহু কাকুতি-মিনতি করিয়া মাতঙ্গিনীকে তাঁহার ভালবাসা জানাইলেন। কিন্তু মাতঙ্গিনী ঘৃণা ও রোষভরে মথুরের কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন মথুর প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, মাতঙ্গিনীকে না খাইতে দিয়া শায়েস্তা করিবেন। মাতঙ্গিনী স্থির করিল, সে না খাইয়া মরিবে তথাপি মথুরের বাধ্য হইবে না। উভয়েই সংকল্প রক্ষা করিয়াছিলেন। মথুর রোজ একবার আসিয়া তাঁহার কার্যের ফলাফল দেখিয়া যাইতেন। অপর দিকে মাধব যখন মাতঙ্গিনীকে উদ্ধার করিলেন, তখন সে উপবাসে মৃতপ্রায়।

ভোর না হইতেই মাধব প্রস্থান করিলেন, কিন্তু মাতঙ্গিনী অতিরিক্ত দুর্বল বলিয়া তাহাকে তখনই লইয়া যাইতে পারিলেন না। তারার সহিত আলোচনায় স্থির করিয়া গেলেন যে, তারা রাত্রি পর্যন্ত মাতঙ্গিনীকে লুকাইয়া রাখিবেন, তখন করুণা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে।

মাধবকে নিরাপদে বাড়ীর বাহিরে পৌছাইয়া দিয়া তারা মাতঙ্গিনীর

কাছে ফিরিলেন এবং তাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "এবার তোমাকে বন্দী করিয়া রাখার পালা আমার।" এই বলিয়া মাতঙ্গিনী যে সেখানে আছে, ইহা যাহাতে অপর কেহ না জানিতে পারে, সেজন্য তারা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলেন। তার পর স্বামীর কক্ষে ফিরিয়া, চাবির গোছাটি বালিশের নীচে রাখিয়া তিনি আবার শয়ন করিলেন। কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারিলেন না—স্বামীর গোপন কথাটি জানিবার পর হইতেই উন্নতমনা ও পতিপরায়ণা তারা ভয়ানক অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন।

মাতঙ্গিনী সমস্ত দিনটা সেই নির্জন গৃহে নিরাপদে অতিবাহিত করিল। সন্ধ্যার পর করুণা আসিয়া তাহাকে মাধবের বাড়ীতে লইয়া গেল। বহু দুঃখ ও দুর্দশা ভোগের পর মাতঙ্গিনী হেমাঙ্গিনীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আনন্দে বিহ্বল হইল।

মিলনের আনন্দে কিছুটা ভাটা পড়িলে হেম বলিল, "দিদি, বল, তুমি আর কখনো আমাকে ছেড়ে যাবে না।"

মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল।

হেম অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, উত্তর দিচ্ছ না যে?"

মাতঙ্গিনী বলিল, "হায় আমার অদৃষ্ট! ছাড়াছাড়ি যে হ'তেই হবে!"

হেম হতাশভাবে বলিল, "কিন্তু তুমি কার জন্য আমাকে ছেড়ে যাবে?"

মাতঙ্গিনী বলিল, "আমি বাবার কাছে যাব।"

১৭

পরদিন সন্ধ্যায় চারিদিক অন্ধকার করিয়া বড় ঝড় উঠিল। বহুক্ষণ ধরিয়া বায়ুর হুঙ্কার, মুষলধারে বৃষ্টিপাত ও কড়-কড় শব্দে বজ্রনিনাদ চলিল।

মথুর ঘোষ একলা বসিয়া আছেন, এমন সময় ঝড়ের ফাঁকে ফাঁকে যেন শাঁখের শব্দ আসিল। তিনি প্রথমে ভাবিলেন, যাহাদের সংস্রবে তিনি অপযশ ও অসম্মানভাগী হইয়াছেন, তাহাদের আহ্বানে আর সাড়া দিবেন না। কিন্তু প্রতিবারই যেন ঐ শব্দ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া আহ্বানের গুরুত্ব জানাইতে লাগিল। অবশেষে মথুর আসন ছাড়িয়া ঝড়ের মধ্যেই বাহির হইলেন এবং সংকেতের স্থানে আসিলেন। সেখানে তিনি ইতিপূর্বে বহুবারই আসিয়াছেন—বহু গোপন পরামর্শও তাঁহাদের হইয়াছে। একটি গাছের তলায় একজন লোক লুকাইয়া ছিল; মথুর অনায়াসেই তাহাকে দস্যু-সর্দার বলিয়া চিনিতে পারিলেন।

মথুর একটু চটাভাবেই তাহাকে বলিলেন, "আবার তুমি এখানে এসেছ কেন? তোমার সঙ্গে তো অনেক কারবারই হয়েছে, আর আমার কাছে এসো না। তোমার বেইমানিতেই আমি সুনাম খোয়ালাম।"

সর্দার ধীরস্থিরভাবে উত্তর করিল, "আমাকে মিছামিছি মন্দ বলছেন—আমরা আমাদের সাধ্যমত সবই করেছি। আমাদের সঙ্গে মিশলে তার ফল ভোগ করতেই হবে।"

মথুর ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "তুমি তো ভাল ক'রেই জান যে, আমাদের আর কোন সম্পর্ক নাই—তবে এই ঝড়ের ভিতর আবার আমার কাছে এসেছ কেন?"

সর্দার দুঃখিতভাবে বলিল, "কারণ, এখন এমন সময় ছাড়া আর বেরুতে সাহস হয় না। আপনি তো জানেন যে, পুলিস আমাদের পিছু নিয়েছে।"

মথুর। তা হ'লে কেন এখনই রাধাগঞ্জ ছেড়ে চ'লে যাও না?

সর্দার। বাবু, আপনি যাই ভাবুন, আমি আপনার ভালোর জন্যই এসেছি। ভিখু পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে—সে সব স্বীকার করেছে।

মথুর খুব ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি স্বীকার করেছে?"

সর্দার হতাশস্বরে বলিল, "এমন অনেক কিছুই যাতে আপনাকে ও আমাকে হয়তো কালাপানির ওপারে যেতে হবে। কিন্তু আমাকে তারা ধরতে পারবে না। রাধাগঞ্জে এই আমার শেষ। তবে আপনি সাবধান।"

এই বলিয়া সর্দার আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঝোপের মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

মথুর বাড়ী ফিরিলেন। ঘণ্টা দুই চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। তাঁহার যথেষ্ট মনের জোর ছিল—ভয় কাটিয়া শীঘ্রই সাহস ফিরিয়া আসিল। তিনি স্থির করিলেন যে, ভিখু যাহাতে নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

এই সময় একজন লোক লাফ দিয়া ঘরে ঢুকিলে মথুরের চিন্তায় বাধা পড়িল। লোকটির গা কাদামাথা এবং তাহা দিয়া বৃষ্টির জল ঝড়িতেছে। সে জেলাকোর্টে মথুরেরই নিযুক্ত একজন বিশ্বাসী কার্যকারক।

সে বলিল, "হুজুর, পালান—পালান; আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করবেন না।"

মথুর হতবুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি?"

কার্যকারক। ভিখু নামে একজন লোক আজ বেলা এগারটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একরার* করেছে যে, সে আপনার কথায় কতকগুলি ডাকাতি ও বে-আইনী কাজ করেছে। সে অবিশ্যি মিথ্যে কথা বলেছে।

মথুরের মুখ মৃতের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি প্রায় কলের মত কার্যকারকের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একরার করেছে?"

---

*স্বীকার

কার্যকারক। হাঁ হুজুর—আর আমি সেই একরারের ঠিক পরেই এখানে রওনা হয়ে এসেছি। বোধ হয় সাহেব আজ রাত্রের মধ্যেই রাধাগঞ্জে পৌঁছিবেন।

মথুর আবার কলের মত কার্যকারকের কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন, "আজ রাত্রের মধ্যেই রাধাগঞ্জ পৌঁছিবেন?"

লোকটি আবার বলিল, "পালান, হুজুর, এখনই পালান।"

মথুর পুনরায় কলের মত বলিলেন, "হাঁ পালাব; তুমি যাও।"

লোকটি চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং মথুর ঘোষকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে আসিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের পিছু পিছু আসিল বিচিত্র বেশধারী একদল পুলিস ও একদল ইতর লোক। তামাসা দেখিবার জন্য সকলে উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও বাড়ীতে মালিককে পাওয়া গেল না।

যাহা হউক, অবশেষে তাঁহার সন্ধান মিলিল। গুদাম-মহলের যে ঘরে মাধবকে এবং তাহার পূর্বে অন্যান্য অনেককে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই ঘরে গৃহস্বামীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। তিনি ফাঁসি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

১৮

শেষ-কথা

সর্দার পলাইয়া বাঁচিল, কিন্তু রাজমোহন তাহা পারিল না। ভিখুর একরারে সে ভীষণভাবে জড়িত হইল এবং পরে ধরাও পড়িল। শাস্তি মাপের ভরসায় সেও ভিখুর ন্যায় অপরাধ স্বীকার করিল। কিন্তু তাহারা পুরাপুরি সকল কথা প্রকাশ না করায় মাপ পাইল না এবং শেষ পর্যন্ত দুইজনকেই দ্বীপান্তরে যাইতে হইল।

মাতঙ্গিনী বেশীদিন মাধবের গৃহে থাকিতে রাজী হইল না। সুতরাং তাহার পিতাকে সংবাদ দেওয়া হইল এবং তিনি আসিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন। সেজন্য মাধব বৃদ্ধের মাসহারা বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু বৎসর কয়েকের মধ্যে—অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই মাতঙ্গিনীর মৃত্যু হইল।

তারা তাঁহার অযোগ্য স্বামীর ভয়াবহ পরিণামের কথা নীরবে স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখবোধ করিতেন। দীর্ঘ বৈধব্য-জীবন যাপনের পর যখন তাঁহার মৃত্যু হইল, তখন বহুলোক তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করিল।

মাধব, চম্পক ও অন্যান্যের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যু হইয়াছে—যাঁহারা জীবিত আছেন, ভবিষ্যতে তাঁহাদেরও মৃত্যু হইবে। তাঁহাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 'এইটুকু বলিয়া আমি সহৃদয় পাঠকের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি।